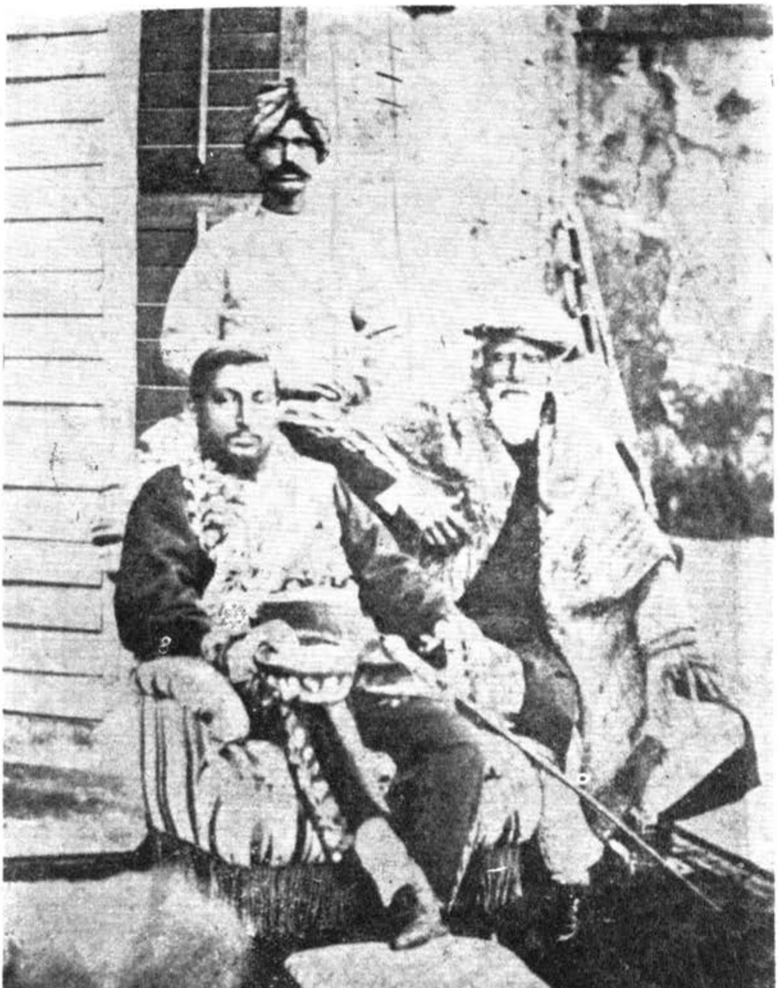
রামতনু লাহিড়ী

ও

তৎকালীন-বঙ্গসমাজ



স্বর্গীয় মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ও
স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী।

B. Kar, Bee Press.

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ

বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি সহিত

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

Calcutta
S. K. LAHIRI & CO
54, College Street
1909

মূল্য ২॥০ টাকা।

PRINTED BY ATUL CHANDRA BHATTACHARYYA
57, HARRISON ROAD, CALCUTTA

ভূমিকা

বাল্যকাল হইতেই রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমার সুপরিচিত। লাহিড়ী মহাশয় আমার পূজ্যপাদ মাতামহ স্বর্গীয় হরচ... মহাশয়ের নিকট কিছুদিন বাড়ীতে পড়িয়াছিলেন। কতদিন, ও... সময়ে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছিল স্বল্পকাল মধ্যে আমার মাতামহ তাঁহার শিষ্যের এমন কিছু গুণ দেখি... যাহাতে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই; সর্ব্বদা তাঁহার প্রশংসা করি... এইরূপে শৈশব হইতেই আমার পিতা মাতার মুখে রামতনু লাহিড়ী ম... প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছি। উত্তরকালে বড় হইয়া ও কলিকাতাতে যত লোককে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তন্মধ্যে এই সাধু পুরুষ... আমার প্রতি বিধাতার এই এক কৃপা যে আমি যত মানুষকে অন্তরে... প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, কোন না... সূত্রে তাঁহাদের অধিকাংশকেই দেখিয়াছি।

১৮৬৯ সালে যখন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচ... তখন যেমন চুম্বকে লৌহকে টানে, তেমনি তিনি আমাকে টানিয়া ... আমাকে একেবারে আপনার লোক করিয়া ফেলিলেন। তদবধি... পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সকলেই আমাকে আত্মীয় বলিয়া লই... ইহা তাঁহাদের সদাশয়তার প্রমাণ।

তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা... করিলেন যে তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তাঁ... শরৎকুমারও আমাকে সে বিষয়ে অনুরোধ করিলেন। গৃহে আসিয়া... ভাবিতে তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা হইল। ... ভাবিয়াছিলাম বিশেষ ভাবে তাঁহার অনুরক্ত ব্যক্তিগণের জন্য... ক্ষুদ্রাকার জীবন-চরিত লিখিব। যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে কখনও... লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রণী হন নাই, যাঁহাদের গুণাবলী বনজাত... ন্যায় কেবলমাত্র কতিপয় হৃদয়কে আমোদিত করিয়াছে, যাঁহাদে... ব্যাপ্তিতে বড় না হইয়া কেবলমাত্র গভীরতাতেই বড় ছিল, তাঁহা... এই প্রকারেই লিখিত হওয়া ভাল; কারণ সাধুতার রসাস্বা...

করে, অপরে সেরূপ করে না; যে কথা শুনিয়া বা যে কাজ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, অপরের নিকট তাহা হয় ত পাগলামি মাত্র। অতএব প্রথমে ী লোকদিগের জন্যই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে ইল, লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোদ্যমে রামমোহন রায়, য়ার, ও ডিরোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাগুরু তাঁহাদিগকে ীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি এবং সেই প্রভাব এই সুদূর সময় পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে। আবার তির স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয়া অত্যগ্রসর দলের মেশিয়াছেন, এরূপ দুই একটী মাত্র মানুষ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লাহিড়ী র একজন। অতএব তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের ন্তরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়া লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ জক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

াহার আর একটু কারণও আছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোনও লেখক, জিও ও তাঁহার শিষ্যদলের প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। । ইহাদিগকে নাস্তিক ও সমাজ-বিপ্লবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী লোক ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অমূলক অপবাদ আর হইতে পারে না। ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যদি কেহ গুরুর সমগ্র-ভাব পাইয়া থাকেন, কহ চিরদিন গুরুকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া পূজা করিয়া থাকেন, াহা রামতনু লাহিড়ী। পাঠক! এই গ্রন্থে দেখিবেন ঈশ্বরে তাঁহার ল ভক্তি ছিল। আমাদের গৃহে যখন তিনি বাস করিতেন, তখন সর্ব্বদা তাম যে অতি প্রত্যূষে তিনি উঠিয়াছেন, এটী ওটী করিতেছেন, এবং গুন্ স্বরে গাইতেছেন—"মন সদা কর তাঁর সাধনা"। আমার বিশ্বাস, এই ধনা তাঁর নিরন্তর চলিত। এই কি নাস্তিক গুরুর নাস্তিক শিষ্য? ের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা দেখাইয়া ইহাদিগকে অকারণ অপবাদ হইতে করাও আমার অন্যতর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার ফল চরমে যাহা দাঁড়াইয়াছে সকলেই অনুভব করিবেন। স্থানে স্থানে বাহিরের কথা প্রকৃত বিষয় া অধিক হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সন্তোষের কারণ এইমাত্র যে, কল মানুষ, যে সকল ঘটনা, ও যে সকল অবস্থা চলিয়া গিয়াছে ও তেছে; তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা গেল, ভবিষ্যতে কাহা- কাজে লাগিতে পারে। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যে ঘটনা বা যে মানুষের উল্লেখ

শুক হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিবার চেষ্টা পাছি। তাহাতেও আনুসঙ্গিক কথার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এজন্য অন্বেষণ ও বহুল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছে। বিলম্বের ইহাও একটা কারণ। ম ইহা নিজেই অনুভব করিতেছি যে এই প্রথম সংস্করণে অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটী থাকিয়া গেল। যদি জীবদ্দশায় দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার অবসর আসে, তবে সে সকল সংশোধন করা যাইবে।

মোটের উপর, এই সাধু পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া একটা উপদেশ সকলেই পাইবেন। এ সংসারে যে খেলে সে কাণা কড়ি লইয়াও খেলে, যে ভাল হইতে চায়, ভাল থাকিতে চায়, তার জন্য পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। এত দারিদ্র্য, এত সংগ্রাম, কয়জন লোকের জীবনে ঘটিয়াছে? এত পাপ প্রলোভনের মধ্যে কয়জন বাস করিয়াছে? এত কুসঙ্গ কয়জন দেখিয়াছে? অথচ সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থাতে এত ভাল কয়জন থাকিতে পারিয়াছে? তিনি সকল দলের, সকল রঙ্গের, লোকের সহিত মিশিতেন; কিন্তু তাহাদের মত ইয়া মিশিতেন না। কস্তুরী যেমন যে ঘরে থাকে সেই ঘরকে আমোদিত রে, তেমনি তিনি যে দলে মিশিতেন, যে ঘরে গিয়া বসিতেন, সেখানে এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য অথচ হৃদয়-মনের পবিত্রতা-বিধায়ক বায়ু প্রবাহিত হইত। তিনি যেন মানুষকে ভাল করিয়া সেই সময়ের জন্য আপনার মত করিয়া লইতেন। অথচ তিনি নিজে তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এই যে নিজের অজ্ঞাত প্রকৃতি-নিহিত সাধুতা, ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল। ইহার মূল্য ভাষাতে কে ব্যক্ত করিতে পারে? এই সাধুতার ছবি একবার দেখিলে আর ভুলা যায় না। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারাও আর ভুলিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থের অতিরিক্তের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র কোন্নগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের এক পত্র প্রকাশিত হইল। দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবে তিনি তাঁহার গুরুকে কি ভাবে স্মরণ করিতেছেন। এইরূপে অনেকের স্মৃতিতে তিনি জাগরূক রহিয়াছেন এবং চিরদিন থাকিবেন। ইতি

বালীগঞ্জ
১১ই ডিসেম্বর, ১৯০৩।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

রামতনু লাহিড়ীর জীবন-চরিত ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে পূর্ব্বকার কোন কোন ও বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে; আবার অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ বাহির হইলে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সংস্করণে তাহার অনেকগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তথাপি এ সংস্করণটী যে নির্দ্দোষ হইল এমন মনে করা যায় না। জীবিত কালের মধ্যে যদি তৃতীয় সংস্করণের সময় আসে, তবে বর্ণনীয় বিষয়গুলি আরও নির্দ্দোষ করা যাইতে পারিবে।

মনে এই একটা সন্তোষ রহিল যে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের কয়েক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া গেলাম; এবং যে সকল মানুষ জন্মিয়া বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের স্থূল স্থূল কথা রাখিয়া গেলাম।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে অনেকে আমার সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এরূপ কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হইত না। ইতি

কলিকাতা
১৩ই মার্চ্চ, ১৯০৯

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

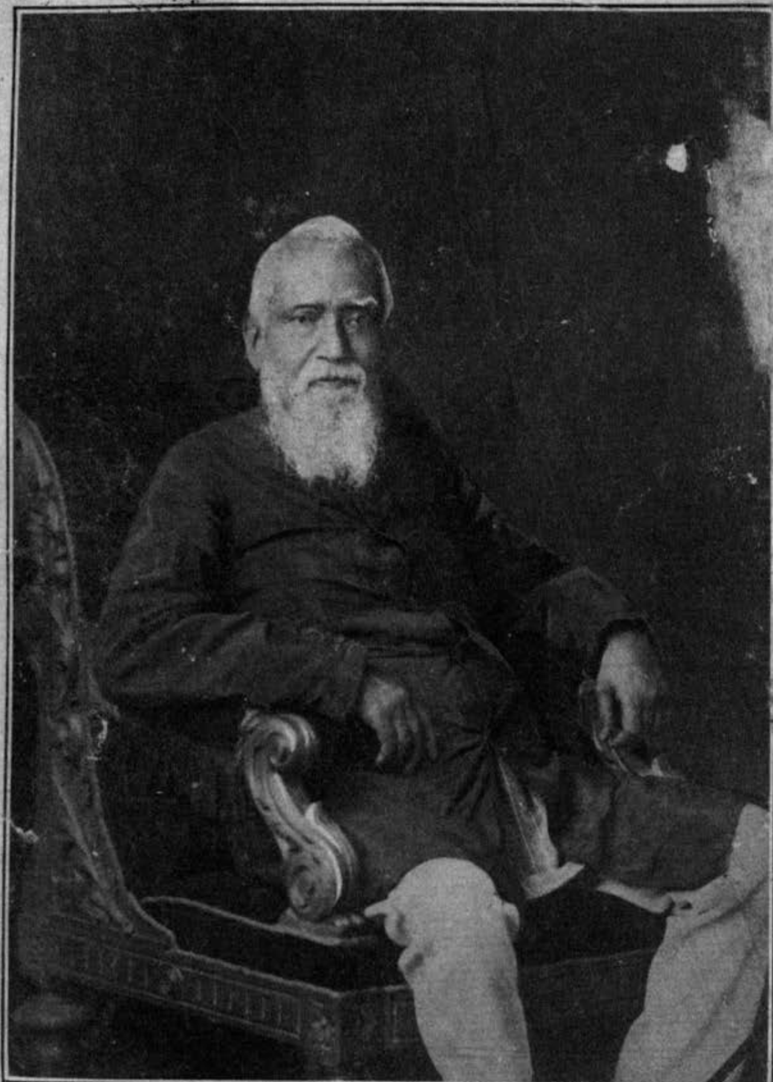
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।

চিত্র সূচী।



স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী।

Bee Press.

লাহিড়ী মহাশয়ের পিতৃকুল।

শাণ্ডিল্য গোত্র

ক্ষিতীশ

(১) ভট্টনারায়ণ — দামোদর

(২) আদিগাঞিওঝা, তৎপুত্র (৩) জয়মনিভট্ট, তৎপুত্র (৪) হরিকুল, তৎপুত্র (৫) বিদ্যাপতি, তৎপুত্র (৬) রঘুপতি,

(৭) শিবাচার্য্য, তৎপুত্র (৮) সোমাচার্য্য, তৎপুত্র (৯) উগ্রমণি, তৎপুত্র তপোমণি, তৎপুত্র সিন্ধুসাগর, তৎপুত্র বিন্দুসাগর, (১০) (১১) (১২)

(১৩) জয়সাগর (বারেন্দ্রভূমে বাসবলিয়া বারেন্দ্র) — মণিসাগর (রাঢ়ভূমে বাস করিলেন বলিয়া রাঢ়ী)

আদীমাধব (চম্পটী গাঁই) — নৌভট্ট (নন্দনা গাঁই) — স্বর্ণরেখ — পিতাম্বর (লাহিড়ী গাঁই ১৪)

সাধু (সাধুবাকচী গাঁই) — রুদ্র (রুদ্রবাকচী গাঁই) — লোকনাথ (লাহিড়ী গাঁই)

(১৫)

(১৬) ভূ[illegible]নাথ — [illegible]

(১৭) দিগম্বর

(১৮) চুটওঝা

হলী (১৯) — (১৯) বলি — (১৯) বাৎস — (১৯) সোমাধিকার — (১৯) বল্লভাচার্য্য (বল্লভাচার্য্য হইতে করণের সৃষ্টি হয়। উদনাচার্য্য ভাদুড়ী তাহার লীলাবতী নাম্নী কন্যার করণ বল্লভাচার্য্যের সহিত করেন)

অর্ক (২০) — কেশব (নকড়িয়া) — দনুজারি

শ্রীনাথ — (২১) শ্রীনারায়ণ (থেঁকাই)

আন্দুই — মাধব (২২) — সারঙ্গ

নরপতি — মহামতি — বারকড়ি (২৩) — নিত্যানন্দ — তুবহ

(২৪) নাথাই — দুর্গাদাস

(২৫) সোমভট্টাচার্য্য

গোপীকান্ত — রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী — শঙ্কর লাহিড়ী (২৬)

(২৭) রামগোপাল লাহিড়ী (চক্রবর্ত্তী) — জয়গোপাল — বিনোদগোপাল — মোহনগোপাল

নরসিংহ (খাজুরা) — বুদ্ধিমন্ত (সাঁতরাগাছি ও মালম পাড়া) — (২৮) রামহরি (কৃষ্ণনগর ও জকরসাই) — হরিরাম (শান্তিপুর)

রামকিঙ্কর — রামগোবিন্দ (২৯)

রামকিঙ্কর → ক্ষেমঙ্কর (দত্তকপুত্র) → প্রিয়ঙ্কর → দুর্গাদাস → রামলাল

রামগোবিন্দ (২৯): কৃষ্ণকান্ত — (৩০) কালীকান্ত — গৌরীকান্ত (দেউলিয়া) — কালীকান্ত অপুত্রক — শম্ভুকান্ত (বাগান)

কৃষ্ণকান্ত: শ্রীকান্ত — কমলাকান্ত — উমাকান্ত

শ্রীকান্ত → নীলকান্ত → অভয়াকান্ত → বিজয়াকান্ত

কমলাকান্ত → শ্যামাকান্ত → গিরিজাকান্ত

উমাকান্ত → তারিণীকান্ত → ধরণীকান্ত (পোষ্যপুত্র)

(৩০) কালীকান্ত → (৩১) রামকৃষ্ণ

গৌরীকান্ত: রামধন — ভোলানাথ

রামধন → শ্যামাচরণ → চন্দ্রভূষণ

ভোলানাথ → ঈশ্বরচন্দ্র → সতীশ

শম্ভুকান্ত: রঘুনাথ — সীতানাথ — শ্রীনাথ — নীলমণি

রঘুনাথ → গোপাল

সীতানাথ → কার্ত্তিক → প্রিয়নাথ

শ্রীনাথ → উমেশ → চন্দ্রনাথ

নীলমণি → দ্বারকা: অন্নদায়িনী — রাধারাণী

- কেশব(৩২)
  - লক্ষ্মীনারায়ণ (৩৩)
- ভবসুন্দরী
- গোবর্দ্ধন অপুত্রক
- রামতনু (৩২)
  - নবকুমার(৩৩)
  - লীলাবতী(৩৩)
  - ইন্দুমতী(৩৩)
  - শরৎ(৩৩)
  - বসন্ত(৩৩)
  - বিনয়(৩৩)
  - মৃদুমতী(৩৩)
- রাধাবিলাস অপুত্রক
- শ্রীপ্রসাদ (৩২)
  - আশুতোষ (৩৩)
- কালীচরণ (৩২)
  - সত্যচরণ (৩৩)
  - সত্যজীবন (৩৩)
  - চিরসুহৃদ (৩৩)

লাহিড়ী মহাশয়ের মাতৃকুল।

- হরিদাস চক্রবর্ত্তী
  - রামরাম চক্রবর্ত্তী
    - রামগোপাল চক্রবর্ত্তী (দেওয়ান চক্রবর্ত্তী)
    - মদনগোপাল রায় (রায়বংশী)
      - রাধাকান্ত রায়
        - জগদ্ধাত্রী দেবী
          - রামতনু লাহিড়ী
        - তারাকান্ত রায়
        - শিবাকান্ত রায়
        - উমাকান্ত রায়
          - উমেশচন্দ্র রায়
            - রাজরাজেশ্বর রায়
          - কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়
            - রাজেন্দ্রলাল
            - দেবেন্দ্রলাল
            - জ্ঞানেন্দ্রলাল
            - নরেন্দ্রলাল
            - সুরেন্দ্রলাল
            - হরেন্দ্রলাল
            - দ্বিজেন্দ্রলাল
      - রত্নেশ্বর রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, ও কৃষ্ণনগরে লাহিড়ীদিগের বাস।

যে লাহিড়ী পরিবার কৃষ্ণনগরের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে অগ্রে কৃষ্ণনগরের বিষয়ে কিছু বলিতে হয়; আবার কৃষ্ণনগরের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই নদীয়ার রাজাদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়; কারণ তাঁহাদিগকে লইয়াই কৃষ্ণনগর; তাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা; তাঁহারা ইহার গৌরব; তাঁহারাই ইহার শ্রীসমৃদ্ধির মূল। কৃষ্ণনগরের রাজ-বংশের সহিত লাহিড়ী বংশীয়গণের বহুকালের যোগ। লাহিড়ীবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ এই বংশের রাজগণের সাহায্যে ও তাঁহাদের আশ্রিত দেওয়ান-দিগের সংশ্রবেই কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঐ বংশের অনেকে মধ্যে মধ্যে এই রাজপরিবারে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত শেষ তিন রাজার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। অতএব সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে অগ্রসর হইতেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণনগর দক্ষিণবঙ্গের রাজধানী ছিল। এখনও কলিকাতার পরে কৃষ্ণনগর অপরাপর কতিপয় সমৃদ্ধিশালী, ও সভ্যতালোকসম্পন্ন প্রধান নগরের মধ্যে একটী প্রথম-শ্রেণী-গণ্য নগর। কলিকাতাতে যে কিছু নূতন আলোচনা উঠে, যে কিছু চিন্তা বা ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার আন্দোলন ত্বরায় কৃষ্ণনগরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; এজন্য কলিকাতার সহিত কৃষ্ণনগরের ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ আছে। ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বঙ্গদেশের যে নব যুগের সূচনা ও বিকাশক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ক্ষেত্রের সমগ্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরের সামাজিক জীবনকে এক সঙ্গে দেখা আবশ্যক। একারণেও কৃষ্ণনগর ও কৃষ্ণ-

নগরের রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত অগ্রে বলার প্রয়োজন। উক্ত ইতিবৃত্ত আমি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণন করিব। কিন্তু তাহা হইলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা শ্রীশচন্দ্র এই রাজদ্বয়ের বিবরণ অপেক্ষাকৃত সবিস্তররূপে বর্ণন করিতে হইবে; কারণ ইহাঁরা কৃষ্ণনগরের, শুধু কৃষ্ণনগরের কেন সমগ্র নদীয়ার, খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভ বিষয়ে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছেন।

নদীয়ার রাজারা এদেশে বহুকাল সুপ্রসিদ্ধ। আমরা বাল্যে পঞ্জিকাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িতাম "শ্রীশচন্দ্র নৃপতেরনুজ্ঞয়া" অর্থাৎ শ্রীশ নৃপতির আজ্ঞা ক্রমে সংকলিত। অনুসন্ধান করিলেই শুনিতাম নদীয়ার রাজা হিন্দুসমাজপতি, কুলধর্ম্মের রক্ষক, ও গুণিগণের উৎসাহ দাতা। এই দেশের রাজগণ একসময়ে দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যখন দেশ যবন রাজাদিগের করকবলিত হইয়া মুহ্যমান হইতেছিল, তখন তাঁহারা স্বীয় মস্তকে ঝড়বৃষ্টি সহিয়া দেশমধ্যে জ্ঞানী ও গুণীজনকে রক্ষা করিয়াছেন; এবং শিল্প, সাহিত্য, কলাদির উৎসাহদান করিয়াছেন। যবনাধিকার কালে দেশীয় রাজগণ অনেক পরিমাণে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের দেয় নির্দ্ধারিত রাজস্ব দিলেই তাঁহারা স্বীয় অধিকার মধ্যে যথেচ্ছ বাস করিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহারা পাত্র মিত্র সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখেই বাস করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ইহাঁদের আশ্রয়ে বাস করিয়া নিরাপদে স্বীয় স্বীয় প্রতিভাকে বিকাশ করিবার অবসর পাইতেন। ইহার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও পুরাতন রাজধানী সকলের সন্নিকটেই, বিষ্ণুপুরের সুগায়ক ও কৃষ্ণনগরের সুকারিকরদিগের ন্যায়, শিল্প সাহিত্যাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে মহাকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, বিক্রমাদিত্যের রাজসভা না থাকিলে যেমন আমরা কালিদাসের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি পাইতাম না, তেমনি গুণগ্রাহী, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা না থাকিলে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাইতাম না।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর দিবসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ জব চার্ণক বাঙ্গালার সুবাদারের সহিত বিবাদ করিয়া, হুগলীর কুঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণী পত্নী সমভিব্যাহারে, হুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুতানুটী নামক গ্রামে আসিয়া এক নিম্ববৃক্ষতলে আপনার শিবির ও নূতন কুঠীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে চার্ণক কিছু দিনের জন্য সেখান হইতেও

হইয়া হিজলীর নিকটে গিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় ৯০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরিয়া আসিয়া সুতানুটীতে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। কালে মহানগরী কলিকাতারূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে ইহা একটী র স্থানমাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নীরূপে নির্ণীত হয়। সেই সময় হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়; এবং শ শতাব্দীর মধ্যেই ইহা ভারতের একটী সর্ব্বাগ্রগণ্য নগরীরূপে পরিগণিত ছ। কলিকাতার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপের রাজাদিগের রাজধানী রই বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রধান স্থান ছিল, এবং নদীয়া জেলা সকল প্রকার া ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এই সকল া ও শিষ্টাচারের উৎস-স্বরূপ ছিলেন। যেমন একদিকে নবদ্বীপবাসী গণ জ্ঞান-প্রভা-দ্বারা দেশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপের ত দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি নদীয়া জেলার লোকের সভ্যতা, সুরসিকতা, শিল্প-কুশলতা, সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতির খ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল। যে রাজবংশের আশ্রয়ে থাকিয়া নদীয়ার এই খ্যাতি প্রতি-হল তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অগ্রে দিতেছি।

জবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—এরূপ জনশ্রুতি যে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূর কোনও যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ আনয়ন করেন। ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই ট্টন হইতে উনবিংশ পুরুষ পরে কাশীনাথ নামে একজন জন্ম গ্রহণ রেন। নি ভূম্যধিকারী ও ধনবান ছিলেন। বিক্রমপুর ইঁহাদের ছিল। কাশীনাথ সম্রাট আকবরের অধিকার কালে বাঙ্গালার দৌরাত্ম্যে বিক্রমপুর হইতে তাড়িত হন। পথে নবাবের সেনানী-ধৃত ও নিহত হন। কাশীনাথের আসন্ন-প্রসবা বিধবা পত্নী আন্দুলিয়া বাগওয়ান পরগণার জমিদার, হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের ভবনে আশ্রয় প্রাপ্ত সমাদ্দারের ভবনে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে। তাহার নাম রাখা হয়। নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ তাহাকে স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সমাদ্দার উপাধি প্রদান করেন। রামচন্দ্র সমাদ্দারের চারিটী পুত্র ভবানন্দই সুপ্রসিদ্ধ। এই ভবানন্দ, বিদ্রোহী যশোহররাজ ত্যর দমনার্থে প্রেরিত, সম্রাট জাহাঙ্গিরের সেনাপতি রাজা বিশেষ সাহায্য করেন। তন্নিবন্ধন সম্রাট তাঁহার প্রতি প্রসন্ন

হইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটী পরগণার জমিদারী ও মজুম উপাধি প্রদান করেন। এই ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের রাজবং প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা।

পূর্ব্বে মাটিয়ারি নামক স্থানে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। ভবানন্দের পৌত্র রাঘব বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানীর পত্তন করেন। ত ঐ স্থানে রেউই নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে বহুসংখ্যক গো জাতীয় লোকের বাস ছিল। ঐ সকল গোপ মহাসমারোহ পূর্ব্বক কৃ পূজা করিত বলিয়া রাঘবের পুত্র রুদ্র রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর রাখিলে তদবধি কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিল। তদ কৃষ্ণনগরই এই রাজগণের বাসস্থান হইয়া রহিয়াছে। কেবল মধ্যে মহার কৃষ্ণচন্দ্র একবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণনগর পরিত পূর্ব্বক ইহার ছয় ক্রোশ দূরে, নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে, শিবনি নামক এক নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন চন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে আ সুতরাং রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে কৃষ্ণনগরই ঐ র‍া রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিবনিবাস নামক ঐ শিবনিবাসের পরিচয় দিতেছে।

ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে ইহাঁদের জমিদারির উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে থাকে। অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৪টী পরগণা এই রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। কবিবর ভারতচন্দ্র তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

> অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা,
> খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
> রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ,
> পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ।
> দক্ষিণের সীমা গঙ্গা-সাগরের ধার,
> পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥

নদীয়ার রাজগণ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী ছিলেন; পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতেন; সর্ব্বদাই দেশের রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিতেন; এবং নামতঃ যব দিগের অধীনে থাকিয়াও সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন রাজার ন্যায় বাস করিতে

এই রাজবংশের রাজগণের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। ...ন্দ্রের পুত্র রামজীবন; রামজীবনের পুত্র রঘুরাম; রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার জীবদ্দশাতেই বঙ্গদেশ মুসলমান-রাজাদিগের হস্ত হইতে ইংরাজদিগের হস্তে নিপতিত হয়। এই কারণে ইঁহার জীবনবৃত্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

যখন রঘুরামের দেহান্ত (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে) হয়, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র ছিল। কিন্তু এই স্বল্প বয়সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্যকুশলতা ও স্বীয় অভীষ্ট সাধনে চাতুরীর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। এরূপ জনরব তাঁহার পিতা কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণে তাঁহাকে উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তদনুসারে রামগোপাল নবাব সন্নিধানে রাজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নাকি এক অপূর্ব্ব চাতুরী খেলিয়া স্বীয় পিতৃব্যকে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গদেশের দক্ষিণ বিভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব অত্যন্ত প্রবল হয়। দিল্লীর সম্রাট, মহারাষ্ট্রপতি শিবজীকে শান্ত রাখিবার মানসে, তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের কোন কোনও প্রদেশের চৌথ অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের চারিভাগের এক ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শিবজীর মৃত্যুর (১৬৮০ খ্রী) পরে একশতাব্দীর মধ্যেই একদিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুত্থান অপরদিকে দিল্লীশ্বরের শক্তির অবসান হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাগপুরবাসী মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদের প্রাপ্য চৌথ আদায়ের ছল করিয়া দিল্লীর সম্রাটের অধিকারভুক্ত নানাস্থান আক্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের উপদ্রব বঙ্গদেশেও ব্যাপ্ত হইল। এই মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব বঙ্গদেশের ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামাতে বঙ্গদেশে ধনী দরিদ্র সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময় হইতেই এই বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। গঙ্গার পূর্ব্বপারের স্থান সকলে সমৃদ্ধিশালী নগর অধিক ছিল না বলিয়া বর্গীগণ প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। এজন্য পশ্চিম পারের অনেক লোক গঙ্গার পূর্ব্বপারে পলাইয়া আসে। অনেকে ফরাসডাঙ্গাতে ফরাসিদিগের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করে। অনেকে কলিকাতাতে ইংরাজদের শরণাপন্ন হয়। এই সময়েই বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদের জননী পুত্রসহ পলাইয়া মুলাযোড়ের

সন্নিহিত কউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সেখানে রাজভবনের এখনও বিদ্যমান। ক্রমে বর্গীরা পূর্ব্বপারেও পদার্পণ করিতে আরম্ভ করে তখন কলিকাতার চারিদিকে "মারহাট্টা ডিচ্" নামক পরিখা খনন করা হয়। সেই সময়ে নদীয়াপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোনও নিরাপদ স্থানে বাস করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণনগরের ছয় ক্রোশ উত্তরে একটী স্থান মনোনীত করিয়া, সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন; এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামে তাহার নাম শিবনিবাস রাখেন। ঐ নগরকে তিনি রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির ও আত্মীয় কুটুম্বের বাস-ভবনে পূর্ণ করিয়াছিলেন। "শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণপুর নামক এক গ্রাম পত্তন করিয়া তথায় বহুসংখ্যক গোপজাতির বসতি করান। তাহারা রাজসর-কারে নানাবিধ কার্য্য করিত। এক্ষণে তাহারা কৃষ্ণপুরে গোড়ো বলিয়া খ্যাত।" নগরের এক ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তরে ইচ্ছামতী নদীতীরে এক গঞ্জ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখেন। ঐ গঞ্জের নিকটস্থ গ্রামও কৃষ্ণগঞ্জ বলিয়া খ্যাত।

কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যকালে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পরলোক গমন করেন; এবং তাঁহার দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিরাজদ্দৌলা সুখপ্রিয় তরলমতি অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার বিবিধ অত্যাচারে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন; এবং কিরূপে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যোগ্যতর কোনও ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে পারেন এই মন্ত্রণা করিতে লাগি-লেন। মুর্শিদাবাদবাসী জগৎশেঠ নামক একজন ধনবান ব্যক্তির ভবনে এই মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। এইরূপ জনশ্রুতি যে রাজা মহেন্দ্র, রাজা রাম নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি প্রথমে এই মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা আহূত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরে আসিয়া তাহাতে যোগ দেন; এবং তাঁহারই পরামর্শক্রমে ইংরাজদিগের সাহার্য্য প্রার্থনা করা স্থিরীকৃত হয়। কোনও কোনও ইতিহাস লেখক এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন কৃষ্ণচন্দ্রের এই মন্ত্রণা সভার সহিত যোগ ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক বলিয়াছেন কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে এ প্রবাদ চলিত আছে, যে পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে পাঁচটি কামান উপহার দিয়া-ছিলেন। সে পাঁচটী কামান অদ্যাপি কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা নিহত হইলে আলিবর্দ্দী খাঁর জামাতা মীরজাফর তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় হইতে ইংরাজগণ বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিল না। মীরজাফর অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় পুত্র মীরণকে রাজকীয়পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হইল; এবং মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিম নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজদিগের সহিত মীরকাসিমের মনোবাদ ঘটে। তিনি ইংরাজদিগের রাজধানী হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিবার আশয়ে মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পরে তিনি দেশের মধ্যে যে যে বড় লোককে ইংরাজদের বন্ধু মনে করিতেন, বা ইংরাজদিগকে তুলিবার পক্ষে সহায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগকে ধরিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে বন্দী ও হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। তদনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কিছু দিন বন্দী করিয়া রাখেন। ইংরাজদিগের ভয়ে হঠাৎ মুঙ্গের ছাড়িয়া পলায়ন করা আবশ্যক না হইলে, মীরকাসিম বোধ হয় সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকেও হত্যা করিতেন; কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়া পড়াতে পিতাপুত্রে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রাজস্বের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। কিন্তু তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়া গেল। কি জানি কিরূপ দাঁড়ায় এই ভয়ে জমিদারগণ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় স্বীয় বাকি প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। অনেক প্রজা নিঃস্ব হইয়া গেল। ইহার উপরে ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ এই দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া শস্যের সম্পূর্ণ ক্ষতি করিল। তাহার ফলস্বরূপ দেশে ভয়ানক মন্বন্তর উপস্থিত হইল। এরূপ দুর্ভিক্ষ এদেশে আর হয় নাই। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" নামে চিরদিন বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই ভয়ানক মহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৭৭০ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই নয়মাসের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় এক কোটি লোকের এবং কেবলমাত্র কলিকাতা নগরে ১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬০০০ লোকের মৃত্যু হয়। এরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, থানা

খন্দে, দলে দলে মানুষ মরিয়া পড়িয়া থাকিত ; ফেলিবার লোক পাওয়া যাইত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নব-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজরাজগণ এই মহামারী নিবারণের বিশেষ কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই।

ইহার পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশকে নানা পরগণাতে ভাগ করিয়া জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে জমিদারির নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা এক দান পত্র লিখিয়া শিবচন্দ্রকে সমুদয় জমিদারীর মালিক করেন। তৎপরে কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ পূর্ব্বে অলকানন্দ নদীতীরে গঙ্গাবাস নামে এক সুরম্য ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করেন। এই স্থানে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। প্রথমার গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন ; কনিষ্ঠার গর্ভে শম্ভুচন্দ্রের জন্ম হয়। শম্ভুচন্দ্র পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাঁহার অপ্রিয় হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র রাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় জননীর সহিত হরধাম নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন। অপরেরা শিবনিবাসেই রহিলেন। এখনও শিবনিবাস ও হরধামে এই রাজবংশের শাখাদ্বয় বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র কার্য্যক্ষম দৃঢ়চেতা অধ্যবসায়শীল লোক ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকার কালে রাজ্য মধ্যে যতপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল, এরূপ কোনও এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায় না। অথচ কোনও বিপদে তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অসীম প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বগুণে তিনি সমুদয় বিপজ্জাল কাটিয়া বাহির হইতেন। চতুর্দ্দিকে যখন বিপদ ঘিরিয়া আসিত তখনও তিনি পাত্র-মিত্র-সভাসদ লইয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেন। গুণগ্রাহিতা ও গুণিগণের উৎসাহদান কার্য্যে ইনি বিক্রমাদিত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজসভা সুপণ্ডিত, সুকবি, সুগায়ক ও সুরসিকগণে পূর্ণ ছিল। ইঁহারই অধিকার কালে নবদ্বীপে হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি, গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ সুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি, শান্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি, সুপণ্ডিতগণ যশঃ-প্রভাতে বঙ্গদেশকে সমুজ্জ্বল করিতেছিলেন। রাজা ইহাঁদের অনেককে বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি-

দান করিয়া গিয়াছেন; ইহাঁরই রাজসভাতে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরাজিত ছিলেন।

ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানান্তর্গত পেঁড়ো-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা পূর্ব্বক, নানাদেশ পরিভ্রমণানন্তর, অবশেষে ফরাসডাঙ্গাতে ফরাসি রাজ্যের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণচন্দ্র বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ফরাসডাঙ্গাতে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিতেন। সেখানে তাঁহার সহিত ভারতের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া যান। এখানে রাজাদেশে তিনি "অন্নদামঙ্গল" রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট-গ্রাম-বাসী বৈদ্যজাতীয় কবি সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনও এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ না হইয়াও তাঁহার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হন নাই। এই সময়েই গোপালভাঁড় প্রভৃতি বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা ও সুরসিকগণ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, যে বঙ্গদেশ যে আজিও ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সুরসিকতা প্রভৃতির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তাহার পত্তন-ভূমিস্বরূপ ছিল।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রভূতশক্তিশালী হইয়াও ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এমন কি যে প্রাচীন কুরীতি-জালে দেশ আবদ্ধ ছিল, সে জালকে তিনি আরও দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন! এরূপ জনশ্রুতি আছে যে রাজা রাজবল্লভ স্বীয় স্বল্পবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য-দুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া দেশ মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত প্রতিকূলতাচরণবশতঃই তিনি সে সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। স্মার্ত্ত ভটাচার্য্যের যে সকল বিধি ব্যবস্থার ভারে প্রাচীন বঙ্গসমাজ বহুদিন ক্লেশ পাইতেছিল, কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভার লঘু না করিয়া বরং দুর্ব্বহ করিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তিনিই যশোহর জেলাস্থ পিরালী ব্রাহ্মণদিগের উপবীত গ্রহণাধিকার রহিত করিয়া তাহাদিগকে জাত্যংশে অতি হীন করিয়া ফেলেন; এবং এ প্রদেশের বৈদ্যগণের উপবীত ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরে রাজা শিবচন্দ্র, (১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ পর্য্যন্ত)

তৎপরে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, (১৭৮৮ হইতে ১৮০২ পর্য্যন্ত) নদীয়ার রাজসিংহাসনে আসীন হন। শিবচন্দ্র অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, উদার, ও স্বজন-পোষক ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অকারণ অনেক অর্থের অপব্যয় করিতেন। একবার একটী বানরের বিবাহ দিয়া লক্ষাধিক টাকা উড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই বাকী খাজনার জন্য জমিদারী বিক্রয় হইতে আরম্ভ হয়। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা বিধান, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন, ও দুর্ভিক্ষাশঙ্কা নিবারণাদির অভিপ্রায়ে, ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য বার্ষিক দেয় রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন। কথা থাকে যে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত হইলে এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী হইবে। তদনুসারে ১৭৯৩ সালে সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়। প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হইয়াছিল বলিয়া অদ্যাপি ইহা দশশালা বন্দোবস্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই দশশালা বন্দোবস্তের প্রচলন হইতেই বঙ্গদেশের অনেক জমিদারের জমিদারি হ্রাস হইতে লাগিল। মুসলমান নবাবদিগের সময়ে যদিও ভূম্যধিকারিগণ বাকি খাজনার জন্য সময়ে সময়ে কারারুদ্ধ ও নিগৃহীত হইতেন, তথাপি তাঁহাদের জমিদারী অক্ষুণ্ণ থাকিত। সময়ে সময়ে নবাবের কৃপাকটাক্ষ পড়িলে নিষ্কৃতি লাভও করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাজগণ একদিকে যেমন ভূম্যধিকারিগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, অপরদিকে তেমনি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলামে চড়াইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই নিলামের কিস্তীর প্রভাবে অনেকের জমিদারী হস্তান্তর হইয়া যাইতে লাগিল। তাই কৃষ্ণচন্দ্রের সময় যে নদীয়া রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের সময় হইতে তাহা নিলামে চড়িতে লাগিল ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পর গিরীশচন্দ্র রাজা হন। (১৮০২ হইতে ১৮৪১ পর্য্যন্ত)। গিরীশচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৪ পরগণা নদীয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; গিরীশচন্দ্রের সময়ে তাহা ৫। ৭ খানি পরগণা ও কতকগুলি নিষ্কর গ্রামে দাঁড়াইল। এই রাজার সময়ে ইহাঁদের জমিদারীর সারভূত প্রসিদ্ধ উখড়া পরগণা নিলাম হইয়া যায়। এই

দারুণ দুর্ঘটনার পর গিরীশচন্দ্র একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় নিতান্ত সুরাসক্ত ও অমিতব্যয়ী হইয়া পড়েন। গিরীশচন্দ্র নিঃসন্তান হওয়াতে একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ও তাহার নাম শ্রীশচন্দ্র রাখেন। এই দত্তক পুত্রকে জমিদারীর ভার দিয়া ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র লোকান্তরিত হন। পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় এই রাজাও গুণিগণের উৎসাহদাতা, কাব্যরসামোদী ও সঙ্গীতাদির অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁর অধিকার কালে দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক কায়েম খাঁ ও তাঁহার তিন সুবিখ্যাত পুত্র মিয়া খাঁ, হস্মু খাঁ ও দেলাওর খাঁ আসিয়া, কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহাদের আগমনে কৃষ্ণনগরে সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছিল। যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র ইহাদেরই নিকটে গীতবাদ্য শিখিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ অনেক ভদ্রলোককে সমবেত করিয়া রাজবাটীতে এক সাধারণ হিতকরী সভা স্থাপন করিলেন; এবং স্বয়ং তাহার সভাপতি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সভার সাহায্যে রাজা একটী মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির নিষ্কর ভূমি বাজাপ্ত হইয়াছিল, ভূম্যধিকারিদিগের দ্বারা আবেদন করাইয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছিলেন। ভূম্যধিকারিগণের এই মহদুপকার সাধন করিয়াই শ্রীশচন্দ্র নিরস্ত হন নাই। দেশের ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতিকর বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ পণ্ডিতগণের সহিত স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধনই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও শ্রীশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, গবর্ণর জেনেরল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অধিকারকালে, কৃষ্ণনগর কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শ্রীশচন্দ্র, পূর্ব্ব পুরুষের রীতি লঙ্ঘন পূর্ব্বক, স্বীয় পুত্রকে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; এবং নিজে কলেজ কমিটীর সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজবাটীতে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন; এবং তাঁহারই প্রার্থনানুসারে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় হাজারিলাল

নামক একজন প্রচারককে সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না পাঠাইয়া হাজারিলালকে প্রেরণ করাতে রাজা দুঃখিত হইয়া রাজবাটী হইতে ব্রাহ্ম সমাজকে স্থানান্তরিত করেন।

ইহার কিঞ্চিৎপরে কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে মিশনারিদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই সময়ে শ্রীশচন্দ্র নিজভবনে একটী অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীশচন্দ্রের জীবনের অবসানকাল যেরূপ হইল তাহা অতীব শোচনীয়। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক তাহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "রাজা বাল্যাবস্থা হইতে পঁৈত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, নিজের ও স্বদেশের হিত বিধান ও মঙ্গলসাধনে সতত রত ছিলেন। তাহার পর কলিকাতাবাসী কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির সুধাচ্ছাদিত বিষপূরিত সংসর্গে তাঁহার আন্তরিক ও বাহ্যিক ভাবের বিস্তর বিপর্য্যয় হইতে লাগিল। তাঁহার বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করা অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল; এবং সুহৃদ্বর্গের সুহৃদ্বাক্য কর্ণকুহরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়া উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন, সকলই নিয়ম-বহির্ভূত হইতে আরম্ভ হইল; দিবানিশি কেবল মদিরাপানে ও গীতবাদ্যের আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর মধ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া উঠিল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। অবশেষে ১২৬৩ বাং (ইংরাজী ১৮৫৭) অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের একবিংশ দিবসে ৩৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।"

শ্রীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে রাজা সতীশ চন্দ্র তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। এই রাজার সময়ে বর্ণনীয় বিষয় অধিক কিছুই নাই। ইনি বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিষয় কার্য্যে অবহেলা পূর্ব্বক কেবল কুসঙ্গীদের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণে কালযাপন করিতে লাগিলেন। গিরীশ চন্দ্রের ন্যায় আয়ব্যয়ের প্রতি ইহাঁরও দৃষ্টি ছিল না।

ইনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ অক্টোবর দিবসে গুরুতর সুরাপান নিবন্ধন উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া মশুরি পাহাড়ে গতাসু হন।

সতীশ চন্দ্র বিলাতী সভ্যতা ও বিলাতী রীতি নীতির অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে এদেশীয় ও ইংরাজ ভদ্রলোকদিগকে রাজবাটীতে



মহারাজা ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর।

(১৩ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন। এই কারণে তাঁহার দেহান্ত হইলে কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ লব সাহেব বলিয়াছিলেন—"এখানকার ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজা গ্রন্থিস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অভাবে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে; এবং অচিরাৎ আর কেহ যে ঐরূপ গ্রন্থিস্বরূপ হইবেন তাহারও প্রত্যাশা নাই"।

সতীশ চন্দ্রের পত্নী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তাঁহার নাম ক্ষিতীশ চন্দ্র রাখা হয়। ইনিই এক্ষণে নদীয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার জন্য সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

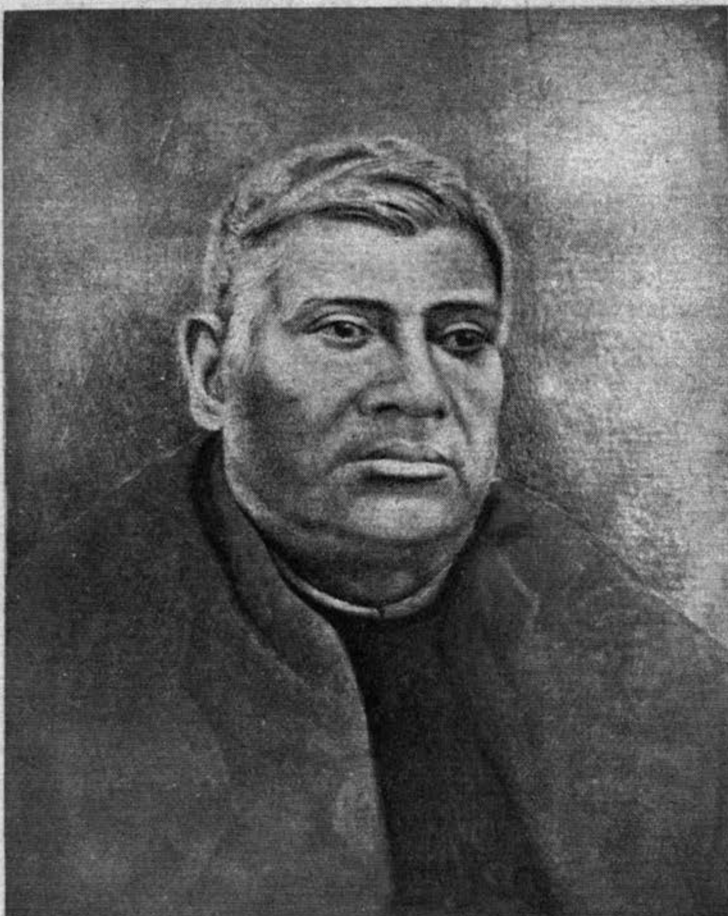
বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যেমন একদিকে নদীয়ার রাজগণের রাজশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে, ইংরাজ-রাজ্য স্থাপন ও বিষয় বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে লাহিড়ীগণ প্রধানরূপে উল্লেখ-যোগ্য; কারণ তাঁহাদের যশঃপ্রভা ত্বরায় দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী বংশের আগমন সম্বন্ধে আদি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এইমাত্র জানিতে পারা যায়, যে এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ রাজসাহী পরগণার কোনও স্থানে বাস করিতেন। সেখান হইতে বোধ হয় বিবাহ-সূত্রে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত-লেখক দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় স্বলিখিত আত্ম-জীবনচরিতে লিখিয়াছেন:—"ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা রুদ্রের সময় হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আমার অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পুত্র রাম রাম চক্রবর্ত্তী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশাস্ত্রে যে যে স্থানে ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও রাম রাম চক্রবর্ত্তীর নামের উল্লেখ আছে, তাঁহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।" অতএব দেখা যায় যে বহু পূর্ব্ব হইতে এই রায়বংশীয়গণ বহুপুরুষ ধরিয়া কৃষ্ণনগরের রাজসংসারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পদে, সম্ভ্রমে ও কুলমর্য্যাদাতে ইহাঁরা বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমন কি ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করেন; সে জন্য ইহাঁরা মতকর্ত্তার বংশ বলিয়া বারেন্দ্র দলের মধ্যে সম্মানিত। কুল-মর্য্যাদা-সম্পন্ন দেওয়ানগণ স্বীয় স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবার জন্য সময়ে সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দ্বারা নাটোরের

রাজাকে অনুরোধ করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে, বরেন্দ্রভূমি হইতে কুলীনদিগকে আনাইয়া নদীয়ার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। অনুমান করি এইরূপে লাহিড়ী, খাঁ, সান্ন্যাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণনগরের সন্নিধানে আসিয়া বাস করিয়াছেন।

লাহিড়ী বংশের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রথমে দেওয়ানবংশে বিবাহ করিয়া নদীয়া জেলাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি তাহা এই, পূর্ব্বে এইবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ দেওয়ানদিগের সহিত মাটিয়ারিতে বাস করিতেন। সেথান হইতে কৃষ্ণনগরে আসেন। রামতনু বাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী কৃষ্ণনগরে আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করেন। রামহরির দুই পুত্র রামকিঙ্কর ও রামগোবিন্দ। রামকিঙ্কর বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমত্তা গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে রাজসরকারে মুন্সীর কাজ প্রাপ্ত হন। রামকিঙ্কর অপুত্রক, তিনি ক্ষেমঙ্কর নামে একজনকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের পঞ্চ পুত্র। কিঙ্কর উপার্জ্জক ও অপুত্রক, গোবিন্দ বহু কুটুম্বভারে পীড়িত; এরূপ স্থলে হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। কিঙ্কর ও গোবিন্দকে পৃথক হইতে হইল। কিঙ্কর নিজ সহোদরের প্রকৃতি জানিতেন। তিনি অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তি একদিকে ও শালগ্রাম শিলা এবং দেবসেবার্থ রক্ষিত সামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তি অপরদিকে রাখিয়া গোবিন্দকে যথা ইচ্ছা মনোনীত করিতে বলিলেন। গোবিন্দ শালগ্রাম শিলা লইয়া পৃথক হইলেন; এবং ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ যে ধার্ম্মিকতাতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনপূজিত ছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রণীত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তন্মধ্যে রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুন্সী প্রধান।
তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান॥

কবিবর গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহাকে গুণবান আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ তিনি সে সময়ে ধার্ম্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোবিন্দের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়ের নাম কাশীকান্ত। কাশীকান্ত কিছুকাল দিনাজপুরের রাজার অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি অতি রাশভারি লোক ছিলেন। পরিবার পরিজন তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকিত।



ডাঃ কালীচরণ লাহিড়ী।

(১৭ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

পরিবারস্থ বালকগণ তাঁহার ভয়ে অসৎপথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না। রামতনু লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব চন্দ্র লাহিড়ী বালককালে পাঠে অনাবিষ্ট ছিলেন, সেজন্য পিতামহ কাশীকান্ত লাহিড়ী একদিন তাঁহাকে পদাঘাত করেন। কেশবচন্দ্র লাহিড়ী উত্তরকালে সর্ব্বদা বলিতেন যে সেই পদাঘাতে তাঁহার চেতনা করিয়া দিয়াছিল; তিনি তৎপরে পাঠে নিবিষ্ট হন। কাশীকান্তের দুই সংসার ও দুই পুত্র। প্রথম পুত্র ঠাকুরদাস লাহিড়ী কিছুকাল রাজা গিরীশচন্দ্রের অধীনে তাঁহার কার্য্যকারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; এই সময়ে তিনি লাহিড়ী দেওয়ান নামে পরিচিত হন। তখন তিনি অধিকাংশ সময় কলিকাতাতে বাস করিয়া নদীয়ারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণর-জেনেরালের লেভীতে যাওয়া প্রভৃতি সমুদয় রাজকার্য্য সমাধা করিতেন।

কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ অতি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শেষ দশায় ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। যে পর্য্যন্ত দেহে বল ছিল স্বপাকে আহার করিতেন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রাতে উঠিয়া যে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিতেন তাহাকে একটী সিকি দান করিতেন। সূর্য্যোদয়ের অগ্রে স্নানাদি সমাপন করিয়া জপ পূজা প্রভৃতিতে বহু সময় যাপন করিতেন। তৎপরে অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম ও অতিথি সৎকারাদিতে অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অবশেষে প্রায় অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে আহার করিতেন। শেষ দশায় একমাত্র বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী পিতার সেবা শুশ্রূষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়তা করিতেন।

রামকৃষ্ণের আট পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র কৃতী হইয়া বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হন। ইনি পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আলিপুরে কেরাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে যশোহরের জজের হেডক্লার্ক বা সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হন। ইহাঁকে ধার্ম্মিক হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ধর্ম্ম পথে থাকিয়া যে কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহা বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবায় ও ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামতনু বাবুর মুখে শুনিয়াছি তাঁহার জ্যেষ্ঠের পিতৃমাতৃ-ভক্তি অপরিসীম ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে পিতার পত্র আসিলে, তিনি তাহা অগ্রে ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতেন, তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিতেন। কেবল তাহা নহে, কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী পরিবারে একথা প্রচলিত আছে যে তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে গিয়া স্বীয় জননীকে দেব-

পূজার কাষ্ঠাসনে বসাইয়া তাম্রকুণ্ডে তাঁহার পদদ্বয় স্থাপন-পূর্ব্বক পুষ্প চন্দনদ্বারা পূজা করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা মাতা নাকি দেবার্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত তাম্রকুণ্ডে পা রাখিতে চাহিতেন না। পুত্র বলপূর্ব্বক পদদ্বয় তাহাতে সন্নিবেশিত করিলে, তিনি ভয়ে কাঁপিতেন, এবং বলিতেন—"কেশব! কেশব! কর কি, আমার যে গা কাঁপচে"। কেশব বলিতেন—"রাখ রাখ, তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা"। এমন পিতার পুত্র ও এমন জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠ যিনি তাঁহাতে আমরা যে প্রকার সাধুভক্তি দেখিয়াছিলাম তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।

রামতনু বাবু রামকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র ও সপ্তম সন্তান। তাঁহার অগ্রে কেশবচন্দ্র ভিন্ন আর তিন সহোদর ও দুই সহোদরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সকলেই অল্প বয়সে গত হইয়া কেবল কেশবচন্দ্র ও ভবসুন্দরী থাকেন। রামতনু বাবুর পরে আর তিন সহোদর জন্মেন। তাঁহাদের নাম রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ ও কালীচরণ। রাধাবিলাস কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে স্বীয় জ্যেষ্ঠের সাহায্য করিতে যান। সেখানে ম্যালেরিয়া জ্বরে দুই ভ্রাতার মৃত্যু হয়। কালীচরণ বাবু কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া চিকিৎসক হইয়া বাহির হন; এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে ডাক্তারি করিতেন। তাঁহার বাল্যকালের বিষয়ে দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় স্বলিখিত আত্ম-জীবন-চরিতে এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন:—"কালীচরণও আমাকে যার পর নাই ভাল বাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল আনিয়া দিতেন; এবং বাটীতে অবস্থান কালে আমার পাঠের বিষয়ে বহু আনুকূল্য করিতেন। * * * * কালীচরণ বড় খোস-পোষাকী ছিলেন। তিনি মেডিকেল কালেজে যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি উড়ানী ও বিনামা ক্রয় করিতেন। যখন বাটী আসিতেন তখন ইহার কোন দ্রব্য আমাকে জেদ করিয়া দিতেন; আর কহিতেন "ছোড়্ দাদা, এসকল দ্রব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায় তেমন আমার অঙ্গে দেখায় না।"

বাল্যে কালীচরণ বাবুর যে সহৃদয়তা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিরজীবন তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। উত্তরকালে তিনি যখন কৃষ্ণনগরের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসকরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মধুর ব্যবহার, সুমিষ্ট ভাষা, ও দীনে দয়া দেখিয়া সকলেরই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার মুখ দেখিলেই রোগীর অর্দ্ধেক রোগ পলাইয়া যাইত! তিনি দীন দরিদ্রদিগকে বিনা ভিজিটে দেখিতেন; এবং অনেক সময়ে নিজ ঔষধালয়

হইতে বিনামূল্যে ঔষধ যোগাইতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী এই,—একবার তাঁহার নিজ ঔষধালয়ে তাঁহার স্বাক্ষরিত একখানি ব্যবস্থা-পত্র আসিল। দেখা গেল ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া, সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন, 'একগাড়ি খড়'; অর্থাৎ ঔষধের সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠাইতে হইবে। এই ব্যবস্থা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল। কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে কালীবাবু ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিলাম রোগীর ঘরের চালে খড় নাই; এই হিমের দিনে যদি সমস্ত রাত্রি হিম লাগে তবে আর আমার চিকিৎসা করিয়া ও ঔষধ দিয়া ফল কি? তাই ভাবিলাম ঔষধের সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠান যাক্।" যে সহৃদয়তাতে এতদূর করিতে পারে তাহাতে যে কালীবাবুকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহাকে দেখিলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রীত হইতেন। তিনি চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া কোনও গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র বালকবালিকা-দিগের মধ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইত। ইহারই উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী কাব্যে" বলিয়াছেন;—

"কোমল স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন;
ছেলেদের কালীবাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিশে যায় যেন নীরে ক্ষীর।"

রাধাবিলাস ও শ্রীপ্রসাদ রামতনু বাবুর ন্যায় মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। শ্রীপ্রসাদও বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে জ্ঞানালোক লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। দেশের বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় বাসভবনে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন;—"১২৪৩ কি ৪৪ বাঃ অব্দে কৃষ্ণনগর-নিবাসী দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। * * * তিনি আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতেন এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ কলম দিতেন।

এই সকল কারণে অনতিকাল মধ্যে তাঁহার বিদ্যালয়ে অনেক বালক পড়িতে লাগিল।”

শ্রীপ্রসাদ যৌবনের প্রারম্ভে যে পরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, উত্তরকালেও তাহা প্রচুর পরিমাণে তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পারসী ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং সেজন্য কৃষ্ণনগরের জজের শেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ শুনিয়াছি যে কার্য্যদক্ষতার গুণে পরিশেষে ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হন, কিন্তু সে পদ ভোগ করিতে পারেন নাই; তৎপূর্ব্বেই ভবধাম পরিত্যাগ করেন। যখন তিনি শেরেস্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাঁহার বেতন ৮০ টাকা মাত্র ছিল। তিনি মনে করিলে অবৈধ উপায়ে প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু যে ধর্ম্মভীরুতা এই লাহিড়ীবংশের একটা প্রধান লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা তাঁহাতেও প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সে সকল পথে কখনও পদার্পণ করেন নাই। প্রত্যুত এই ৮০ টাকা বেতন হইতে যথাসাধ্য গরীব দুঃখীর সাহায্য করিতেন। পূজার সময়ে এদেশের লোক কয়েকদিনের জন্য জগতের দুঃখ শোক ভুলিয়া, নববস্ত্র পরিধান করিয়া, উৎসবানন্দে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে; গরীবের-গরীব যে তাহারও প্রাণে এই সময়ে নববস্ত্র পরিবার সাধ হয়। শ্রীপ্রসাদের কোমল ও পরদুঃখকাতর হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে গরীবদের সেই সাধ পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। তিনি পূজার সময়ে গরীব দুঃখীদের মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, সময়ে অসময়ে দীন জনের দুঃখ দেখিলেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত হইত। তিনি গোপনে অনেক দান করিতেন। আমি বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি একজন বিপন্ন আত্মীয়ের সাহায্যার্থ নিজ বেতনের অর্দ্ধেক দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, “কাহাকেও বলিও না।” ইহা কৃষ্ণনগরের লাহিড়ী বংশেরই অনুরূপ কার্য্য।

এতক্ষণ গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র কাশীকান্ত লাহিড়ীর শাখাস্থ ব্যক্তিগণের গুণাবলীরই কথা বলিতেছি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর চারিটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলাতে গিয়া বাস করেন। তাঁহার শাখা এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না।

চতুর্থ পুত্র কালীকান্ত অপুত্রক গত হন। তৃতীয় গৌরীকান্ত ও পঞ্চম শম্ভুকান্ত, ইঁহাদের শাখাদ্বয় কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত দৌলিয়া ও বাগানবাড়ী নামক স্থানদ্বয়ে অবস্থিত হইয়াছেন। কাশীকান্তের শাখা কৃষ্ণনগর কদমতলাতে বাস করেন। এই জন্য তাঁহারা কদমতলার লাহিড়ী-পরিবার নামে অভিহিত; এবং অপরেরা দৌলিয়া ও বাগানের লাহিড়ী—পরিবার নামে আখ্যাত। গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ীর গুণাবলীর নিদর্শন অপর শাখাদ্বয়েও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এক জনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইঁহাতে লাহিড়ী বংশের ধর্ম্ম-প্রবণতা আর এক আকারে ফুটিয়াছিল। ইঁহার নাম দ্বারকানাথ লাহিড়ী। ইঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

অনুমান ১৮২৭ কি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ জন্ম হয়। ইনি বাগানের শম্ভুকান্ত লাহিড়ীর পৌত্র ও নীলমণি লাহিড়ীর পুত্র। শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয়া জননীর সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বোধ হয় শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সামান্যরূপ বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ কোন ঘটনা ঘটে, যাহাতে ইঁহার জননী দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হন। জননীর দুঃখ দেখিয়া সেই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতুলালয় হইতে বহির্গত হন, যে নিজে উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়া মাতার দুঃখ দূর করিতে না পারিলে আর আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাইবেন না ; বা কাহাকেও নিজের সংবাদ দিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কয়েক আনা পয়সা মাত্র পথের সম্বল লইয়া পদব্রজে দুই তিন মাস হাঁটিয়া আগরাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন শান্তিপুর-নিবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দেন ; এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বারকানাথ ইংরাজী বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৌপ্য ও স্বর্ণপদক পারিতোষিক পাইলেন ; এবং কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আগরাতেই একটী উচ্চ বেতনের কর্ম্ম পাইলেন। প্রথম বেতন পাইয়াই জননীকে পত্র লিখিলেন ; এবং তাঁহার যাইবার জন্য পাথেয় পাঠাইলেন। ভগ্ন-হৃদয়া মাতা বহুকাল পরে নিরুদ্দেশ সন্তানের পত্র ও তাঁহার প্রেরিত অর্থ পাইয়া কতই ক্রন্দন করিলেন। ক্রমে জননী আগরাতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দ্বারকানাথ মাতৃসেবা ও গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার

দুইটী কন্যাসন্তান জন্মিল। দ্বারকানাথ যখন বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন; এবং ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে একজন উপরিতন কর্ম্মচারীর সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মিল; এবং তিনি প্রকাশ্যভাবে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবীর প্রতিকূলতাবশতঃ তাঁহার জীবন ঘোর নির্য্যাতনময় হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সেই নির্য্যাতনের ও স্বীয় পিতার অপরাজিত ধৈর্য্যের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"জননীর বিশ্বাস ছিল বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পোড়াইয়া দিলে, উপাসনা কালে ব্যাঘাত জন্মাইলে, মত বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা; এবং এই ভ্রম-বশতঃ যতদূর সম্ভব পুত্রের ধর্ম্মসাধনায় বাধা জন্মাইতে অবহেলা করিতেন না। কত যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছেন তাহা কি বলিব! কতবার বাইবেল লুকাইয়া রাখিতেন। আর প্রায় এমন দিন যাইত না, যাহাতে মাতার দুর্ব্যবহারে ও কঠোর পীড়নে সন্তান কষ্ট না পাইতেন! মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন ক্রমাগত বলিতেন—"এমন ছেলে বিধর্ম্মী এ কি প্রাণে সয়?" বহুকালব্যাপী এই ঘোর নির্য্যাতনেও সে প্রকৃতি কখনও চঞ্চল হয় নাই; ধর্ম্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই; এবং একদিনের জন্যও কেহ কখনও মাতার প্রতি তাঁহাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সেই সদানন্দ শান্তমূর্ত্তি সব প্রতিকূল অবস্থায় সমান ধীর থাকিত। তিরস্কার উৎপীড়ন অম্লানভাবে অটল ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়াছেন। এমন গভীর মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল! উপার্জ্জনের সমুদয় টাকাই মাতার হস্তে দিতেন। মাতা হাতে তুলে যা দিতেন তাতে কখনও দ্বিরুক্তি ছিল না। খৃষ্টের ত্যাগস্বীকার, স্বর্গীয় অতুলন ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা, তিনি জীবনের প্রতি কার্য্যে, তাঁহার প্রভুর আদর্শ যেন প্রতিফলিত করার জন্যই তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন! এমন খ্রীষ্টগত জীবন জগতে দুর্লভ! রবিবারগুলি তাঁহার জীবনের যেন আরও পরীক্ষা ও কষ্টের দিন ছিল। রবিবার যে খ্রীষ্টশিষ্যের কি সাধনার দিন তাহা তাঁহার জীবনে সুস্পষ্ট দেখেছি। বিশেষ আহারাদি সে দিন হইত না; কেবল নির্জ্জনে বসে শাস্ত্র পাঠে ও প্রার্থনাদিতে সময় যাপিত হইত। আর মাতাও সে দিন যেন অধিক বিষাদে, মনঃক্ষোভে, তিরস্কার পীড়নে, সন্তানের সংশোধন করিবেন ভেবে সকল প্রকার কষ্ট

দিতেন; নানা প্রকারে সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। কিন্তু তিনি সকলই অবিচলিত ভাবে বহন করে ক্লেশজনিত বিষাদের মৃদু হাসিতে কেবল বলিতেন—'মা আমার শাস্ত্রে কি আছে জানিলে তুমি কখনও এমন করিতে না।" * * * পুত্রের প্রতি এই কঠোর ব্যবহার যে দেখিত সেই অবাক্ হইত। সকলেই বলাবলি করিত—"এত ধৈর্য্য কোথায় পাইল, যাতে নিয়ত মার এত অন্যায় এমন করে সয়ে থাকে।"

যে পরিবারে এরূপ পিতার স্মৃতি থাকে সে পরিবার ধন্য! যে বংশের লোকে মাতার পদদ্বয় তাম্রকুণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিতে পারে, সে বংশের পক্ষে এই মাতৃভক্তি আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই চরিত্রের গুণেই, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়, সিপাহীগণ যখন আগরানগর আক্রমণ করে, এবং প্রত্যেক ইংরাজ ও প্রত্যেক দেশীয় খ্রীষ্টানকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তৎপ্রদেশীয় হিন্দুগণই তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। এই চরিত্র দেখিয়াই সুরাপান-নিবারিণী সভার সুপরিচিত বক্তা রেভারেণ্ড ইভান্স (Rev. Evans)—যিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস কাল দ্বারকানাথের সহিত আগরার কেল্লাতে বন্দী ছিলেন—বলিয়াছিলেন;—'Meek as a lamb, humble as a baby, true as steel'—অর্থাৎ তিনি নিরীহতাতে মেষশাবক, বিনয়ে শিশু, ও সত্যনিষ্ঠাতে ইস্পাত স্বরূপ ছিলেন। এই চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়াই ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন—"বয়সে সে আমার কনিষ্ঠ ভাই ছিল, কিন্তু চরিত্রগুণে আমার পিতৃস্থানীয়!"

দুঃখের বিষয় দ্বারকানাথের জীবন অকালেই বিলীন হইয়াছিল। ১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে এই লাহিড়ী বংশীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই সহৃদয়, সদাশয়, ধর্ম্ম-পরায়ণ, পরোপকারী ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। এরূপ কুলে এরূপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় চরিত্রগুণে সর্ব্বজনপূজিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সাধুতা গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ী হইতে নামিয়া আসিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম্ম-পরায়ণ রামকৃষ্ণে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এই বংশের ব্যক্তিগণকে বিভূষিত করিয়াছিল। এখনও এই লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণনগরে মান সম্ভ্রমে অগ্রগণ্য হইয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁদের অনেকে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে দেশের নানাস্থানে

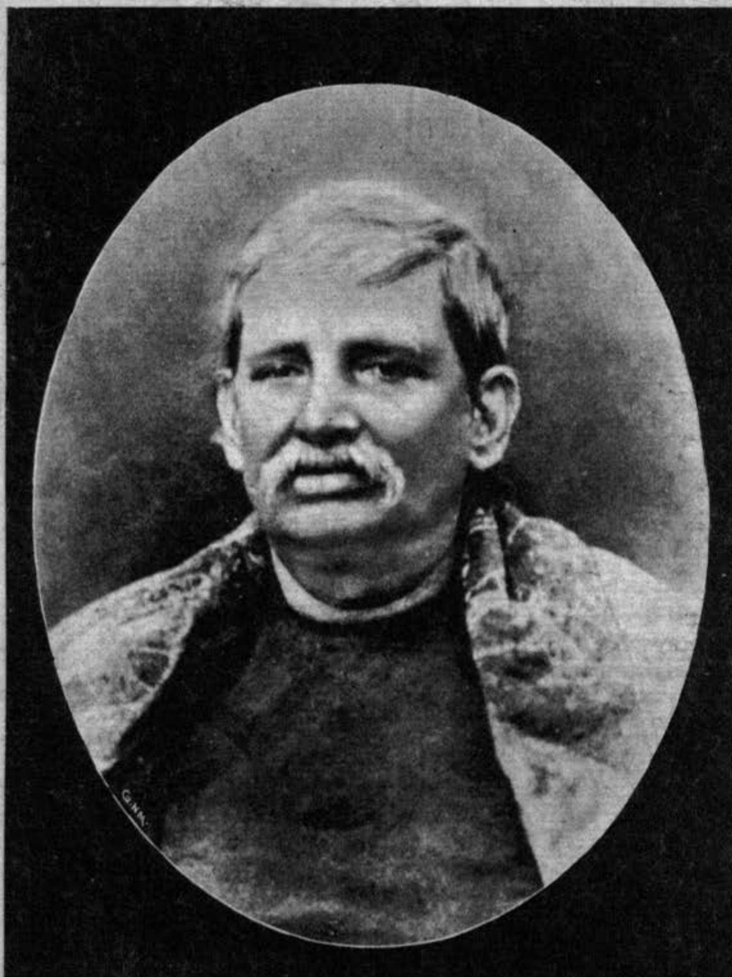
বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যিনি যেখানে গিয়াছেন, প্রায় সকলেই সাধুতা, সত্য-নিষ্ঠা, এবং পরোপকারাদি গুণে প্রতিবেশিবর্গের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশা ও কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাসে বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র শিবনিবাসে জন্মিয়াছিলেন; এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ কালীচরণ কৃষ্ণনগরের বাটীতে ভূমিষ্ঠ হন; তদ্ব্যতীত আর সকলেই বারুই-হুদাতে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা রামকৃষ্ণ বারুইহুদাগ্রামবাসী, রাজবাটীর দেওয়ান, রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জগদ্ধাত্রী যে রায়বংশের কন্যা তাঁহারা কৃষ্ণনগরে দেওয়ান চক্রবর্ত্তীর বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি খাঁ, ভাদুড়ি, সান্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেয় প্রভৃতি ছয় ঘর প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটীর দেওয়ানের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা যদি ধর্ম্মভীরু লোক না হইতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের ন্যায় রাজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজেরাই কার্য্যতঃ রাজসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহারা তাহা না করিয়া বরং আপনাদিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখনও রাজবাটীর অনেক বিষয় ইঁহাদের নামে বেনামী রহিয়াছে। সে সকল বিষয় ইঁহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন। প্রভুদিগকে মারিয়া আত্ম-পোষণ করা দূরে থাকুক, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্ম-জীবন-চরিতে দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের বিলক্ষণ সাংসারিক অসচ্ছল উপ-



স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

(পৃষ্ঠা ২৩

B. Kar, Bee Press.

স্থিত হইয়াছে। এই বংশের পূর্ব্বকথা যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে বংশ পরম্পরা ক্রমে ইঁহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় খাত-পুষ্করিণী খনন, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ দরিদ্রে দান প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মেই নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক একজন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের গুণাবলীর কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। তন্মধ্যে একজনের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। যাহা শুনিলে অনেকে উপন্যাসের বর্ণিত বিষয় বলিয়া অনুভব করিবেন; কিন্তু তাহা সত্য ঘটনা। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় মহাশয়ের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এই সকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল যে তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি আমরা কখনও দেখি নাই। তিনি এমন মিষ্টভাষী ছিলেন যে কখনও কাহাকেও তুই বলেন নাই; এমন দানশীল ছিলেন যে সাধ্যাতীত না হইলে কখনও কোনও যাচককে নিরাশ করেন নাই; পর-স্ত্রী অভিলাষ বোধ হয় তাঁহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই; শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান এই দুর্লভ ধর্ম্ম কেবল তাঁহাতেই দেখিয়াছি। যে সকল হিংস্রক জ্ঞাতিরা তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছিলেন, ও তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও কখন একটী কষ্টদায়ক বাক্য বলেন নাই; এবং তাঁহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশে কখনও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের দুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের পীড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন; মৃত্যুকালে তাঁহাদের গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন; এবং পরিশেষে তাঁহাদের শ্রাদ্ধের কালে সহায় হইয়াছেন।"

"তাঁহার উদার স্বভাবের দুইটী দৃষ্টান্ত আমার সন্তানদের জন্য লিখিতেছি। তিনি প্রতিবেশী কায়স্থ জাতীয় অতি দুর্দ্দশাপন্ন একটী যুবাকে আমাদের রাজবাটীর কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিয়ৎকাল পরে সে রাজার প্রিয় খানসামা হইয়া যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে। একদা আমাদের কয়েক বিঘা ভূমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে আমার অগ্রজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক তাহার সমুচিত দণ্ডবিধানে উদ্যত হন। খানসামা জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে ক্লেশ দিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিছুদিন পরেই ঐ কৃতঘ্ন যুবক কোনও সুযোগ পাইয়া আমাদের আরও কয়েক বিঘা ভূমি অধিকার করিবার জন্য মিথ্যা মোকদ্দমা উত্থাপন করে। ইতিমধ্যে

তাহার বাটীতে হঠাৎ ডাকাইতি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন চৌকিদারকে ডাকাইতের দলে দেখিয়াছে এবং জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এই ডাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কর্ত্তারা অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজবাটীতে আশ্রয় লইলেন। গ্রামস্থ লোক তাহার এই অন্যায়াচরণে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া দারোগার নিকট কহিলেন, যে তাঁহারা ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং দারোগা এ ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট করিলেন। মাজিষ্ট্রেটের পেষকার কর্ত্তাদিগকে কহিয়া পাঠাইলেন যে "যৎকিঞ্চিৎ উদ্যোগ ও ব্যয় করিলেই তাহারা ছয়মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইতে পারে।" তাহারা সমুচিত দণ্ড পায় ইহা সকলেরই ইচ্ছা হইল ; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কহিলেন ;—"আমরা বিপদ্‌মুক্ত হওয়াতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ; এ নির্ব্বোধদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলে আর কি ফল লাভ হইবে ? এতাদৃশ ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই।

"এক শীতকালের রাত্রিতে তিনি রাজার নিকট হইতে বাসস্থানে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিচারক ব্রাহ্মণ তদীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রা যাইতেছে। প্রতি রাত্রিতেই তিনি আসিলে তাঁহার জলপানের আয়োজন করিয়া দিত এবং তাঁহার আহার সমাপনান্তে নিদ্রা যাইত। জ্যেষ্ঠতাত ভাবিলেন, যখন এ ব্যক্তি আমার আসিবার পূর্ব্বেই আমার শয্যায় নিদ্রিত হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোনও অসুখ জন্মিয়াছে। কিঞ্চিৎকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দুইখানি কুশাসনের উপরে শয়ন করিলেন। গাত্রে যে বস্ত্র ছিল তাহাই তাঁহার শীত নিবারণের উপায় মাত্র হইল। নূতন সংবাদে রাজার বড় আহ্লাদ হইত বলিয়া, একজন প্রভাতকালে এবিষয় তাঁহার গোচর করিল। রাজা এই আশ্চর্য্যাবস্থার দর্শনোৎসুক হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠতাতের সন্নিহিত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তখনও সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। রাজার আগমনে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হওয়াতে জাগরিত হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা ঈষৎ হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তোমার শয্যায় পরিচারক সুখে শয়ন করিয়াছিল ; আর তুমি এই কুশাসনে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি ?" তিনি উত্তর করিলেন "আমার কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যদি অসুখ হইয়া থাকে তবে উহার কষ্ট হইত।" তাঁহার এই সহৃদয় ব্যবহারে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া

সকলকে কহিলেন যে "যদি সংসারে কেহ ধার্ম্মিক থাকেন তবে তিনি এই ব্যক্তি।"

"তাঁহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। তাঁহার সাত আটটী পুত্র অকালে কাল-কবলিত হয়; তথাপি তাঁহার বদনে ক্ষণকালের নিমিত্ত কেহ কখনও শোক-চিহ্ন দেখেন নাই। প্রত্যেক পুত্র বিয়োগ সময় তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন এবং তাহার পর অধৈর্য্য পরিবারগণের শোকশান্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। যাঁহার কোমল হৃদয় চিরশত্রুর দুঃখে কাতর হইত, তাঁহার চিত্তকে যে জীবনাধিক পুত্র শোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"

কি অপূর্ব্ব সাধুতা! এ বিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুন্নত হয়। এ স্থানে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, যাঁহার আত্মজীবন-চরিত হইতে এই সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। আত্মীয়-স্বজনের পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এ সকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এই সকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়।

জগদ্ধাত্রী দেবী এইরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ গৃহে জন্মিলে ও বাড়িলে মানুষ যাহা হয় তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে অধিক কথা জানিতে পারি নাই। যাহা কিছু জানিয়াছি তাহাতে তিনি যে মনস্বিতা ও সাধুতা বিষয়ে একজন অগ্রগণ্য স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগদ্ধাত্রী পিতার একমাত্র কন্যা, তিন ভ্রাতার অগ্রজা, ও রূপলাবণ্যে এবং বিবিধ সদ্‌গুণে গৃহের শ্রী-স্বরূপা ছিলেন। শৈশবে রাজা শিবচন্দ্র তাঁহাকে কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। তাঁহাকে তাসের পাযাক পরাইয়া, নিজ হস্তীর উপরে হাওদাতে তুলিয়া, সঙ্গে লইয়া নগরভ্রমণ করিতেন। এই কন্যা পিতৃগৃহে কিরূপ আদরে ছিলেন সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। ধন সম্পদে, মান সম্ভ্রমে, তাঁহার পিতার সমকক্ষ লোক তখন কৃষ্ণনগরে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি মনে করিলে সুখে সচ্ছন্দে চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করিতে পারিতেন।

সে সময়ে কুলীন জামাতৃগণ অনেক সময়ে শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। তদনুসারে রামকৃষ্ণ ও পরম সমাদরে চিরজীবন শ্বশুরালয়েই বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, জগদ্ধাত্রী তাহা পছন্দ করিতেন না। তিনি স্বীয় পতির আত্ম-সম্মানকে এত মূল্যবান জ্ঞান করিলেন, যে কিয়ৎকাল পরেই সন্তুষ্টচিত্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কদমতলাতে পতিগৃহে নিতান্ত সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তিনি গুরুজনের আদেশের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া ঘর নিকাইতেন, জল তুলিতেন, ধান ভানিতেন, সমুদয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; এবং তদুপরি এতগুলি পুত্র কন্যার পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অথচ একটী দিনের জন্য কেহ তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিত না। তিনি ধনীর কন্যা হইয়া কিরূপ দারিদ্র্যে বাস করিতেছেন তাহা দেখিয়া কেহ তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে সে দয়া তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ধান ভানিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার পিতৃগৃহের একজন প্রাচীন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থাতে দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"আমি এই খানে বড় সুখে আছি। তুমি মাকে বলিও আমার কোনও দুঃখ নাই। আমি কাজ করিতে বড় ভালবাসি।" তিনি রূপে গুণে লোকের চিত্তকে এমনি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে যখন তিনি চলিয়া যাইতেন লোকে পশ্চাৎ হইতে বলিত—"যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

এই লাহিড়ী ও রায়পরিবারদিগের একটী বিশেষ সদ্‌গুণ এখানেই উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবন্ধন অতীব স্পৃহণীয়। জগদ্ধাত্রী যখন সন্তুষ্টচিত্তে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতেন, নিজ দুঃখের কথা কাহাকেও জানাইতেন না, তখন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতেন না। প্রায় প্রতিদিন নীলকুঠী হইতে ফিরিয়া গৃহে যাইবার সময় ভগিনীর গৃহে পদার্পণ করিতেন, এবং গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইতেন। এইরূপ মাতামহকুলে রামতনু জন্মগ্রহণ করিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে তাহার পিতা রামকৃষ্ণ সামান্য পৈতৃক বিষয়ের আয়ের দ্বারা ও নিজে তৎকাল-প্রসিদ্ধ লালা বাবুদিগের ম্যানেজারি করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তদ্দ্বারা কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্রের দৌহিত্রদ্বয়, হরিপ্রসন্ন রায় ও নন্দপ্রসন্ন রায়, সে সময়ে বড় লালা ও নূতন লালা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামকৃষ্ণ ইঁহাদের

সামান্য বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজারি করিতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সদাশয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও সাধুচরিত্রের বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা কৃষ্ণনগরে প্রচলিত আছে। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় আত্মজীবনচরিতে এক স্থানে বলিয়াছেন ;—"এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও দোষ কখনও কেহ দেখেন নাই বা শুনেন নাই ; পরন্তু সকলেই তাঁহাদের গুণের কথা কীর্ত্তন করিতেন।"

রামকৃষ্ণ নিজে যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ প্রভুও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লালা বাবুদের ম্যানেজারির বেতন স্বল্পই ছিল। ধর্ম্মভীরু রামকৃষ্ণ উপরি আয়ের দিকে চাহিতেন না ; সুতরাং কেশবচন্দ্র উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লেশেই তাঁহার সংসার চলিত।

রামকৃষ্ণ সন্তানদিগকে সর্ব্বদা কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। প্রতিদিন সায়ংকালে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কিয়ংকাল ধর্ম্মালোচনাতে যাপন করিতেন। সে সময়ে পাড়াতে দেবীপ্রসাদ চৌধুরী নামে একজন ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ইনি স্থানীয় আদালতে মহাফেজের কাজ করিতেন। দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান, স্বীয় ভবনে শাস্ত্রপাঠ, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দু-গৃহস্থোচিত সমুদয় কার্য্যের জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে আসিতেন। তদ্ভিন্ন বিষয়-কর্ম্ম-সূত্রেও বহুসংখ্যক লোক তাঁহার অনুগত ছিল। তাঁহার বাড়ী এখনও কৃষ্ণ-নগরে চৌধুরীবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ভবনে গিয়া বসিতেন। সেখানে নসীরাম দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন আসিয়া যুটিতেন। সেই সাধুসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের সায়ংকালটা সুখেই কাটিত। তিনি যাইবার সময়ে কেশবচন্দ্রকে, পরে রামতনুকে, সঙ্গে লইয়া যাইতেন। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একব্যক্তি ইংরাজী জানিতেন। শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া বৃদ্ধেরা ধর্ম্মালোচনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। নসীরাম দত্তের উল্লেখ করিয়া রামতনু বাবু তাঁহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"হায়! তাঁহাকে আর এ জীবনে দেখিব না।" এই নসীরাম দত্তের বিষয়েই কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখিয়াছেন ;—"কৃষ্ণনগরের মাথের পাড়াবাসী নসীরাম দত্তের পুত্র যে এক পূজার কোঠা প্রস্তুত করেন, তাহার অব্যবহিত সম্মুখের ভূমির অধিকারী অন্য একজন ছিলেন। সেই ভূমিখণ্ড

না পাইলে তাঁহাদের পূজার কোঠা অকর্ম্মণ্য হয় বলিয়া ঐ পুত্র তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ঐ অন্যায় অধিকার রহিত করিবার জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচারক ইহার তদন্ত জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, অর্থী কহিলেন যে, "যদি প্রত্যর্থী আপনার সাক্ষাতে শুদ্ধ কহেন যে, এ ভূমি তাঁহার, তাহা হইলে আর আমি ঐ ভূমির দাবী রাখি না।" নন্দীরামের পুত্র পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে তাঁহাকে বাটীর মধ্যে রাখিয়াছিলেন। বিচারপতির আদেশে তাঁহাকে তদন্ত স্থানে আসিতে হইল। বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি অতি ক্রোধভরে উত্তর করিলেন; "উহাকে (পুত্রকে) আমি ঐ ভূমি অধিকার করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি লক্ষ্মীছাড়া আমার কথা শুনে নাই, ঐ ভূমিতে আমার কোন স্বত্ব নাই।"

রামকৃষ্ণ নিজে যেমন সাধু ছিলেন, তেমনি সাধু সদাশয় ব্যক্তিদের সঙ্গেই মিশিতেন। জনকজননীর দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ বৃথা যায় নাই। তাঁহাদের সন্তানগণ বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কেশবচন্দ্র লাহিড়ী শৈশব হইতে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে একবার তিনি গুরুজনের আদেশে গোয়াড়ি হইতে নিজস্কন্ধে এক মণ চাউলের বস্তা বহিয়া দিয়াছিলেন। আর একবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে কেশবচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে পিতামহী ঠাকুরাণীর গৃহে উঠিবার পৈঠাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন কাহাকেও কিছু বলিলেন না; পরে পিতামহী শয়ন করিলে, পাড়ার দুই একটী অনুগত সমবয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া, রাতারাতি ইষ্টক প্রভৃতি সংগ্রহ পূর্ব্বক, পৈঠাটী মেরামত করিয়া ফেলিলেন। প্রাতে পিতামহী ঠাকুরাণী দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়া কহিলেন—"এ কেশবের কাজ আর কারু নয়।" কেশবকে তিনি এমনি চিনিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র লাহিড়ীর জীবনের ঘটনা সকল সবিশেষ জানিবার উপায় নাই; কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যে প্রকার ভক্তি দেখিতাম তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার জ্যেষ্ঠের চরিত্র তাঁহার চরিত্র গঠন বিষয়ে বিশেষরূপে কাজ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সাধুতার পরোক্ষ প্রমাণ কিছু কিছু আছে। তিনি যখন কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আলিপুরে জজ আদালতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঐ কর্ম্ম ব্যতীত তিনি

অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় লোকের মোকদ্দমাদির সহায়তা করিয়া এক প্রকার মোক্তারের কাজ করিতেন; তাহাতেও কিছু কিছু উপরি আয় হইত। সে সময়ে আদালতের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করিত, তাহারা উৎকোচ, মিথ্যাসাক্ষ্য, প্রবঞ্চনাদির দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই ধনী হইয়া উঠিত। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অতিরিক্ত আয় এত অল্পই ছিল যে তিনি নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ ও কৃষ্ণনগরের বাটীর সাহায্য করিয়া কলিকাতার ভ্রাতাদিগের শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহাকে পরের অনুগ্রহাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল।

এইরূপ পিতা মাতা ও এরূপ জ্যেষ্ঠের ক্রোড়ে শিশু রামতনু জন্মগ্রহণ করিলেন। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে ছয়টী সন্তানের পর, বিশেষতঃ কয়েকটী গত হওয়ার পর, পুত্র সন্তান জন্মিলে সেটী কিরূপ আদরের সামগ্রী হয়, সকলে তাহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তাহাতে আবার মাতামহ রাধাকান্ত রায় মহাশয় রাজবাটীর দেওয়ান ও গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। সুতরাং ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যে শিশু রামতনু ভূমিষ্ঠ হইলে স্বল্পকালের মধ্যেই বারুইহুদা ও কৃষ্ণনগরের লোক জানিতে পারিল দেওয়ানজীর দৌহিত্র জন্মিয়াছে। সূতিকাগৃহের দ্বারে সমাগত পল্লী-বাসিনীগণের মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনিতে ক্ষুদ্র গ্রামখানি কাঁপিয়া উঠিল। পুরস্কারের প্রত্যাশায় দলে দলে বাদকগণ আসিয়া নিরন্তর বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল; বারুইহুদার বাটী হইতে সুসংবাদ লইয়া কৃষ্ণনগরের বাটীতে লোক ছুটিল; পথে, ঘাটে, সরোবরে স্নানের কালে, গৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন—"লাহিড়ী-দের ছেলে হয়েছে; আহা বেঁচে থাকলে হয়!"

এবম্প্রকার অভ্যর্থনার মধ্যে রামতনু সূর্য্যের আলোক দেখিলেন। তৎপরে প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যে সকল কৃত্য ও কুলাচার হইয়া থাকে সকলি হইল। অর্থাৎ অষ্টাহে আটকৌড়া, সূতিকা-নিষ্ক্রমণ সময়ে ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য যথাবিহিত প্রণালীতে নিষ্পাদিত হইল।

অতঃপর শিশু রামতনু সূতিকা কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া সকলের চক্ষের অগোচরে, জননীর স্নেহময় বক্ষে, শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র নবজাত সহোদরের রূপগুণের বর্ণনা করিয়া জননীকে কতই উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ করান হইল।

সে সময়ে পাঠশালাতে শিশুগণের পাঠারম্ভ হইত। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একটী পাঠশালা ছিল। সম্ভবতঃ সেইখানেই শিশু রামতনুর পাঠারম্ভ হয়। সে সময়কার পাঠশালের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তাঁহারা আসিয়া কোনও ভদ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে মধ্যস্থলে একটী খুঁটী ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দ্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিত। বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এইজন্য বলিতেছি, তৎকালে পাঠ্যগ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না। কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিত, এবং যাঁহারা সন্তানদিগকে রাজকার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে পারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী সরকারে কর্ম্ম করিতে বা বিষয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে থাকিত।

পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল, যে বালকেরা প্রথমে মাটীতে খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, কড়ানিয়া, বুড়কিয়া প্রভৃতি লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত; সর্ব্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠীপত্র লিখিতে শিখিত। সে সময়ে শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এই টুকু স্মরণ আছে, যে পাঠশালে শিক্ষিত বালকগণ মানসাঙ্ক বিষয়ে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইত; মুখে মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক কষিয়া দিতে পারিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড় হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিত। এক্ষণে যেমন ভৃত্যের দশ দিনের বেতন দিতে হইলেও ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কাগজ ও পেন্সিল চাই, ত্রৈরাশিকের অঙ্কপাত করিয়া কাগজ ভরিয়া ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না।

গুরুমহাশয়গণ বর্ত্তমান স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোনও কমিটী বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন বালককে বা বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে মাসে সামান্য ১০।১২ টাকা আয়

হইত। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব, পার্ব্বণ, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপরি কিছু কিছু যুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে ছেলে লুকাইয়া গুরুমহাশয়কে যত দিতে পারিত, সে তত তাঁহার প্রিয় হইত। সে অনুপস্থিত থাকিলে বা পাঠে অমনোযোগী হইলেও সমুচিত সাজা পাইত না। যে সকল বালক কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। উঠিতে বসিতে, নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত। হাত ছড়ি, নাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল। পাঠশালে আসিতে বিলম্ব হইলে হাত ছড়ি খাইতে হইত; অর্থাৎ আসনে বসিবার পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাতা পাতিয়া দাঁড়াইতে হইত, অমান সপাসপ্, পাঁচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল হাত ছড়ি। নাড়ুগোপাল আর এক প্রকার। অপরাধী বালককে, গোপালের ন্যায়, অর্থাৎ চতুষ্পদশালী শিশুর ন্যায় দুই পদ ও এক হস্তের উপরে রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোন ভারি দ্রব্য চাপাইয়া দেওয়া হইত; হাত ভারিয়া গেলে, বা কোনও প্রকারে ভারি দ্রব্যটী স্বস্থানভ্রষ্ট হইলে তাহার পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক গুরুতর বেত্র প্রহার করা হইত। ত্রিভঙ্গ আর এক প্রকার। শ্যামের বঙ্কিম মূর্ত্তির ন্যায় বালককে এক পায়ে দণ্ডায়মান করিয়া হস্তে একটী গুরু দ্রব্য দেওয়া হইত; একটু হেলিলে বা বারেক মাত্র পা খানি মাটীতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত। কোন কোনও গুরু ইহার অপেক্ষাও গুরুতর শাস্তি দিতেন; তাহাকে চ্যাংদোলা বলিত। কোনও বালক প্রহারের ভয়ে পাঠশাল হইতে পলাইলে বা পাঠশালে না আসিলে এই চ্যাংদোলা সাজা পাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্য চারি পাঁচ জন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ও বলবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহারা তাহাকে ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, বা বৃক্ষশাখায়, যেখানে পাইত সেখান হইতে বন্দী করিয়া আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দিত না, হাতে পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিত। তাহার নাম চ্যাংদোলা। এই চ্যাংদোলা অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে সেই অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন। এই প্রহার এক এক সময়ে

এত গুরুতর হইত যে হতভাগ্য বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় মলমূত্রে ক্লিন্ন হইয়া যাইত।

১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, মিষ্টর উইলিয়াম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা সকলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রায় চতুর্দ্দশ প্রকার সাজা দিবার প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বালক মাটীতে বসিয়া নিজের এক খানা পা নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকিবে; বা নিজের উরুর তল দিয়া নিজের হাত চালাইয়া নিজের কাণ ধরিয়া থাকিবে; বা তাহার হাত পা বাঁধিয়া পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া জলবিছুটী দেওয়া হইবে, সে চুলকাইতে পারিবে না; বা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে বালককে পূরিয়া মাটীতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যকালেও যে এই সকল সাজার প্রকার ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে শাস্তির ভয়ে বালকেরা অনেক সময়ে পাঠশালা হইতে পলাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিত। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ইহার কয়েক বৎসরের পরের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—"আমার সমবয়স্ক স্বসম্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরে চৌধুরীদিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতো ভ্রাতা ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমার বাটীতে আসিতেন; কিন্তু গুরু মহাশয়ের দূতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অনুপায় দেখিয়া একদা এক বারওয়ারি ঘরের মাচার উপরে অনাহারে এক দিবা ও এক রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে যাপন করেন। ঐ গুরু-মহাশয় চৌধুরীবাটীর এক বালকের গণ্ডদেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে তাহার চিহ্ন তাঁহার যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।"

লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে তিনিও এক এক সময়ে প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে পলাইতেন; সেজন্য তাঁহার পিতা গভীর মনোবেদনা পাইতেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে একটি বালক ছিল, সে অল্প বয়সেই চুরি বিদ্যাতে

পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বালকটী তাঁহাকে চুরি করিবার জন্য সর্ব্বদা প্ররোচনা করিত। লাহিড়ী মহাশয় বলেন, যে তাহার প্ররোচনাতে তিনি চুরি করিতে শিখিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসেন ও অনেক তিরস্কার করেন। লাহিড়ী মহাশয় এই ঘটনার অন্ততঃ ষাটি বৎসর পরে তাঁহার দৈনিক লিপিতে লিখিয়াছেন—"হায়! আমি তখন আমার জ্যেষ্ঠের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে সাহসী হই নাই, কেবল কাঁদিয়াছিলাম।" যিনি ষাটি বৎসর পরে স্বকৃত একটী বাল্যসুলভ পাপ স্মরণ করিয়া হায় হায় করিতে পারেন, তিনি যে কি ধাতুতে গঠিত ছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

বালক রামতনুর ঘোড়া চড়িবার বাতিকটা অতিশয় প্রবল ছিল। এরূপ অনুমান করা যায়, তখন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও জনপদ সকল হইতে কখন কখনও লোকে বেতো ঘোড়া চড়িয়া কৃষ্ণনগরে মামলা মোকদ্দমা বা বিষয়কর্ম্ম করিতে আসিত। তদ্ভিন্ন কলিকাতার অনুকরণে নূতন ধরণের কতকগুলি ভাড়াটিয়া গাড়ি চলাও আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সকল শকটের ঘোড়া যথেচ্ছভাবে রাজপথের পার্শ্বে, বা মাঠে চরিয়া বেড়াইত। বালক রামতনু সমবয়স্ক বন্ধুদলে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ সকল ঘোড়া ধরিয়া চড়িতেন। যাহাদের ঘোড়া তাহারা জানিতে পারিলে তাড়া করিত, তখন বালকদল চক্ষের নিমিষে খানাখন্দ পার হইয়া পলায়ন করিত। এই ঘোড়া চড়িবার সখটা এতই প্রবল ছিল, যে তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটী অধিক বয়স্ক বালক ঘোড়া কিনিবার জন্য এক জনের অনেকগুলি টাকা চুরি করিয়াছিল। তিনি তখন তাহার উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

বালক রামতনু যে কেবল ঘোড়া চড়িয়া সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন তাহা নহে। তখন কৃষ্ণনগরের চতুর্দ্দিকে বালকদলের বিহারোপযোগী অনেক উদ্যান ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছিল। রাজপরিবার ও তৎসংসৃষ্ট পরিবারগণ এই সকল উদ্যানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ইহার মধ্যে শ্রীবন সর্ব্বোপরি উল্লেখ-যোগ্য। এই উদ্যানটী কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে অঞ্জনা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই উদ্যান স্থাপন করিয়া এখানে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। তদবধি ইহা কৃষ্ণনগরের একটী আকর্ষণের বস্তু ছিল।

দুঃখের বিষয় শ্রীবনের সে পূর্ব্ব শ্রী আর নাই। যে সুরম্য প্রাসাদ ইহার প্রধান সৌন্দর্য্য ছিল তাহার ভগ্নাবশেষও এখন নাই। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকার উক্ত স্থানের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"এই স্থান অতি রমণীয়। অঞ্জনা যদিও এখন স্থির-সলিলা হইয়া গতিবিহীনা হইয়াছে, তথাপি তদীয় পূর্ব্বকালীন মনোহারিণী শোভা এক-কালে তিরোহিত হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ইহার উভয় কূলে গ্রাম্য বৃক্ষ-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এরূপ অপরূপ শোভা হইয়া রহিয়াছে, যেন কোন প্রকৃতি-প্রিয় মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, নিবিড় কানন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাহ্নে, অপ-রাহ্নে, অথবা রজনীকালে, এই নদীতে নৌকারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন সঞ্চারণ করিবামাত্র অসুস্থ হৃদয়ে সুস্থতা লাভ হয়। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে আমা-দিগের সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুসূদন এই নদীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে কহিয়াছিলেন,—"হে অঞ্জনে! তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তোমাকে কখনই ভুলিব না, এবং তোমার বর্ণনা করিতেও ক্রটী করিব না।" এই রাজার (ঈশ্বরচন্দ্রের) পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষেরা এই নদীতটস্থ প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে যে কানন আছে, তাহাতে বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার নাম মধুপোল এবং ঐ কাননের পূর্ব্বাংশে যে উপবন আছে তাহার নাম আনন্দ-কানন রাখেন। মধুপোল অশোক, চম্পক, বক, কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচুকন্দ, কিংশুক, শাল্মলী ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ-শ্রেণীতে শোভিত ছিল; এক্ষণে কেবল কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষমাত্র আছে। তথাপি বসন্তকালে এই তরুরাজি বিকশিত রক্তবর্ণ কুসুমাবলিতে অলঙ্কৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল একদা আমাদের সুবিখ্যাত কবি মদনমোহন কাব্য-রত্নাকর এই শোভা সন্দর্শনে লিখিয়াছিলেন—"জগদীশ্বর সর্ব্বভূতকে অদ্ভুত প্রদর্শনার্থ যেন রাশীভূত সিন্দূর রক্ষা করিয়াছেন।"

এই কবিজনের মনোহরণকারী সুরম্য কানন যে বালক রামতনু ও তাঁহার বয়স্যগণকে বার বার আকৃষ্ট করিত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা সকলেই এক কালে বালক ছিলাম; অনেকেই পল্লীগ্রামে প্রকৃতির নিস্তব্ধ রমণীয়তার মধ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়াছি; সুতরাং বালক কালের সে সুখের কথা সকলেই স্মরণ করিতে পারি। গ্রামের পার্শ্বে যে কিছু রমণীয় দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, যে কিছু

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছিল, যে কিছু সম্ভোগ্য পদার্থ ছিল, আমরা কিছুই দেখিতে বা সম্ভোগ করিতে ছাড়ি নাই। বালক রামতনু ও তাঁহার বয়স্যগণও ছাড়েন নাই। সে সকল সম্ভোগের বস্তু এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু হায় সে সম্ভোগের শক্তি হারাইয়াছি! জীবনের ক্ষুদ্র সুখে সে অভিনিবেশ চলিয়া গিয়াছে! বোধ হয় হৃদয়ের প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা হারাইয়াছি বলিয়াই তাহা চলিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বরের এই সৌন্দর্য্যময় জগতে সুখের আয়োজন যথেষ্ট আছে; কিন্তু সে সুখ বোধ হয় কেবল পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তির জন্যই আছে, অপরের জন্য নহে। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকার তাঁহারই স্বপ্রণীত আত্ম-জীবনচরিতে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন;—"বোধ হয় যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখই তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যে সকল সুখ ভোগ করিয়াছি, সে সব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র যেন পলাইয়া যায়। ধরিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও আর ধরা যায় না। সেই শ্রীবন, সেই লালবাগ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তৎসমুদয় ত আর আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহা হয় না। স্পৃহা দূরে থাকুক তাহার নাম ও উল্লেখ করা যায় না।"

যাহা হউক বিবিধ প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নির্ম্মল বাল্য সুখে রামতনুর বাল্যকাল গত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত বালুকা-রাশির দ্বারা নির্ম্মিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প কাল হইল মানবের আবাস ভূমিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণের জন্য আগমন করেন, তখন তাম্রলিপ্তক বা তমলুক নগরকে সমুদ্রতটে দেখিয়াছিলেন। এই নগর উৎকলের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ও বৌদ্ধগণের একটী প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখানে সহস্রাধিক বৌদ্ধ যতিকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তমলুক এখন সমুদ্র-তীর হইতে কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে! গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত বালুকারাশি দ্বারা গঙ্গার মুখভাগ ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া বঙ্গদেশের পরিসর কতই বর্দ্ধিত হইতেছে! সাগরগামিনী নদী সকলের তরঙ্গানীত বালুকারাশির ও সাগরতরঙ্গানীত বালুকারাশির ঘাত প্রতি-ঘাতে বালুশৈল সকল উত্থিত হইয়া নদী সকলের মুখে কি পরিবর্ত্তনই ঘটাইতেছে। অনুমান করি, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ এই প্রকার সাগর-গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া মানবের বাসোপযোগী হইয়া থাকিবে। সে অধিক দিনের কথা নহে। ইতিহাসের গণনায় বহু পূর্ব্বে হইলেও মানব-সমাজের যুগ গণনাতে বহু দূর নহে। সুতরাং বঙ্গভূমির দক্ষিণ বিভাগের ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি

এখনও নবীন রহিয়াছে। এই জন্য এই ভূমি-ভাগ শ্যামল উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ, ফল-শস্য-ভূষিত ও নয়ন মনের প্রীতিকর। এই কারণে বিদেশীয় পর্য্যটকগণ বঙ্গভূমিকে ভারতের উদ্যান-ভূমি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই উদ্যান-ভূমির মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ নবদ্বীপ বিভাগ বিচিত্র রমণীয়তাতে পূর্ণ ছিল। এইরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে বালককাল অতীত হইলে তাহা যে সুখেই অতীত হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বালক রামতনু পূর্ণমাত্রায় সে সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বালক রামতনু এইরূপে বয়স্যদিগের সহিত আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় পিতা মাতা তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সে সময়ে দেশের, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর সমাজের, নীতি-সম্বন্ধীয় জল-বায়ু দূষিত ছিল। সাধু রামকৃষ্ণের ন্যায় নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীয় স্বীয় গৃহে ও পরিবারে যে সকল সদ্‌গুণ দেখিতে চাহিতেন দেশীয় সমাজে সে সকল সদ্‌গুণের বড়ই অভাব হইয়াছিল। বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি সম্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে, হিন্দু রাজত্বের অভ্যুদয়ে ও প্রভাব কালে প্রাচীন গ্রীকপর্য্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু জাতিকে, সাহসী, সত্য-নিষ্ঠ, সরল-প্রকৃতি, আতিথেয়, স্বদার-নিরত দেখিয়া গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাঁহাদের রাজ-সভার দূষিত সংস্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্ব্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে থাকে। মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা। যদিও বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, এবং কৌলীন্য প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনী-দিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং সেটা যেন এক-প্রকার সম্ভ্রমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংস্রবে হিন্দুধনীদিগের মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা। ইহা যেন প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকার্য্য হইত

সেই যেন বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইত। এইটী মুসলমান অধিকারের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কারণে দেখিতে পাই মুসলমান অধিকার কালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি, এই অধিকার কালে যে সকল তন্ত্র শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে ও ইন্দ্রিয়াসক্তি ধর্ম্মের নাম ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে। এই কালমধ্যে অভ্যুদিত অধিকাংশ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়াসক্তির পূতিগন্ধে আপ্লুত।

মুসলমান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা। দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশয়ে অপর সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। এইরূপে পরাধীনতাবশতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, লোকে মিথ্যা কহিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা পাইত না। তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরাজদিগের রাজস্ব আদায়ের প্রনালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইয়া তাহা ও অন্তর্হিত হইল। লোকে দেখিল সত্য নির্দ্ধারণ ইংরাজের আইন বা আদালতের লক্ষ্য নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্য। সুতরাং লোকে জানিল যে, যে যত মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহারই জয়াশা তত অধিক। এইরূপে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইল। লোকে জাল জুয়াচুরি দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি দ্বারা ধনলাভ করিয়া সমাজ মধ্যে গৌরব লাভ করিতে লাগিল। দেশের এরূপ দুর্দ্দশা না ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালিজাতির প্রতি যেরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন না। দেশের সাধারণ নীতির এই দুর্গতি হওয়াতে সর্ব্বত্রই লোকের প্রতিদিনের আলাপ আচরণ তদনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগরও সেই দূষিত বায়ুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন, এবং রাজা গিরীশ চন্দ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় গিরীশচন্দ্রের অধিকার কালেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের

মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম কেন্দ্রীভূত রাজ-পরিবার ও তাঁহাদের স্বসম্পর্কীয়, সংসৃষ্ট ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ; ইঁহাদের সংখ্যাই বোধ হয় অধিক ছিল। দ্বিতীয় স্বাধীনবৃত্তি-সম্পন্ন পরিবারবর্গ,—ইঁহাদের অনেকে পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন; অপরাংশ বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশেরই অন্যান্য জেলাতে বাস করিতেছিলেন। তৃতীয় ইংরাজদিগের নব-প্রতিষ্ঠিত কাছারীর উকীল, মোক্তার আমলা প্রভৃতি; ইঁহাদের অধিকাংশ খড়িয়া তীরবর্ত্তী গোয়াড়ি নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন।

রাজা গিরীশচন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কথা অগ্রেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অতি অসার, অল্পবুদ্ধি ও নীচ-প্রকৃতি লোকের বশ্যতাপন্ন ছিলেন। তাঁহার সময়ে স্বার্থপর ও হীনচরিত্র লোকসকল রাজবাটীকে ঘিরিয়াছিল। সুতরাং রাজবাটীর দৃষ্টান্ত ও হাওয়া কিরূপ ছিল সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই সময়ে রাজবাটীর সহিত লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ সংস্রব হয়। সাধু রামকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঠাকুর দাস লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন গিরীশ-চন্দ্রের কার্য্যকারক ছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি।

রাজবাটীতে সচরাচর কিরূপ পাপ প্রশ্রয় পাইত তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পরবর্ত্তী রাজা শ্রীশচন্দ্রের সময় হইতে দিতেছি। শ্রীশচন্দ্রের বিবিধ সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তিনি ঐ সকল পাপে লিপ্ত ছিলেন, কারণ সে সকল পাপ তখন পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বলিখিত জীবনচরিতে উহার কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে দুইটী বিবরণ দিতেছি।

একটী বিবরণ এই, শ্রীশচন্দ্র অতিশয় গীতবাদ্যের অনুরাগী ছিলেন; সর্ব্বদা সুগায়ক সুগায়িকাদিগকে আনাইয়া গীতবাদ্য শুনিতেন। একবার এইরূপ এক গায়কদলে একটী অল্পবয়স্কা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে রাজা এক প্রকার কিনিয়া লইলেন। সেই বালিকা রাজবাড়ীতে নিয়মিত দাসীদলের মধ্যে পরিগণিতা হইয়া রহিল। রাজার অবসর হইলেই তাহাকে আনিয়া গান শুনিতেন। ক্রমে তাহার বয়স ১৪। ১৫ বৎসর হইল। তখন দেওয়ান রাজাকে বলিলেন—"এ বালিকা এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে চলিল, আর ইহাকে সভামধ্যে আনা কর্ত্তব্য নয়।" রাজা তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তৎপরে তাহাকে যখন তখন সুরাপান করাইয়া বন্ধুগণ-সহ তাহার সহিত

হাস্য পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। আর একটী বিবরণ এই:—"এক রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠা তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে। তখন সুরাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল ছিল; সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। ঐ সুন্দরী যখন পেশোয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণা হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা ঐ সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাঁহার পদ শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন।"

যে সমাজে সমাজপতি রাজা বন্ধুগণ-সহ একটা দাসী শ্রেণীস্থ বালিকাকে সুরাপান করাইয়া তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে লজ্জা বোধ করেন না, যে সমাজে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভবনে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ আমোদ চলিতে পারে, সে সমাজের নীতির অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

ইহা পরবর্ত্তী ঘটনা হইলেও গিরীশচন্দ্রের সময়ে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা ছিল না, তাহা বলিতে পারা যায়। রাজসংসারের সম্পর্কীয় ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের নীতি এই প্রকার হাওয়াতেই বৰ্দ্ধিত হইত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অনেক বিদেশে বাস করিতেন সুতরাং কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার সহিত তাঁহাদের যোগ ছিল না, এজন্য তাঁহাদের বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করা গেল। যে সকল বিদেশীয় আমলা প্রভৃতি কর্ম্মসূত্রে গোয়াড়ীতে বাস করিতেন, তাঁহাদের অবস্থা কি ছিল দর্শন করুন। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় বলিতেছেন:—"গোয়াড়ীতে কয়েক ঘর গোপ মালোগাড়ার ও অন্যান্য নীচজাতির বসতি ছিল। পরে যখন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয় সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবেরা গোয়াড়ীর পশ্চিম দিকে ও তাঁহাদের আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা ইহার পূর্ব্বদিকে আপন আপন বাসস্থান

নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল, বা মোক্তারের এক একটী উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল! যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।”

এ সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু লজ্জা বোধ করিয়া প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হইবে। দেওয়ানজী তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের যে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তদনুরূপ অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিদ্যমান ছিল। সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—“ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন,” এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই? দেশের সর্ব্বত্রই এ সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অন্যান্য প্রদেশের ত কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভদ্রসন্তানেরা প্রকাশ্যভাবে দূষিত-চরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। এখনও কি করিতেছেন? এখনও প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে কলিকাতা সহরের ভদ্র পরিবারের যুবকগণ ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের অপরাপর বহু ভদ্রলোক গিয়া অর্থ প্রদান করিয়া উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। অপরাপর প্রদেশে এখনও যে অবস্থা রহিয়াছে তাহা অতীব লজ্জাজনক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে কুলটাগণ প্রকাশ্যভাবে ভদ্রবংশীয় পুরুষগণের মধ্যে যাতায়াত করিতে সংকুচিত হয় না; পঞ্জাবে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ

পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সঙ্গে বাস করে, তাহারা ইহাদের উপার্জ্জনের দ্বারা পালিত হয়; ইহাদের সহিত কাজটাও একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে! বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে অনেক দেবমন্দিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, নামে তাহাদের দেবতাদিগের সহিত বিবাহ হয়, কিন্তু ফলে তাহারা বিগর্হিত উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করে। ইহাদের সমাজিক অবস্থা প্রকাশ্য গণিকাদিগের অবস্থা অপেক্ষা একটু উন্নত। ইহারা অসংকোচে ভদ্রপরিবারের মধ্যে যাতায়াত করে; যাত্রা মহোৎসবাদিতে নৃত্যগীত করে; এবং অনেক স্থলে ভদ্রকুল-কামিনীগণের অপেক্ষা অধিক সমাদর পায়। সুতরাং সে সময়কার কৃষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে শোক করিয়া আর কি করিব।

এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই তখন এ সম্বন্ধে দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা। তখন অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত। তরলমতি বালকেরাও এমন সকল বিষয় জানিত যাহা তাহাদিগের জানা উচিত নয়। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয়ের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ হইতে না হইতে পিতা রামকৃষ্ণ ও মাতা জগদ্ধাত্রী যে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের বালকদিগের সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধু রামকৃষ্ণ সন্তানদিগকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। কিন্তু নিজের বিষয় কর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখা ও সম্ভব ছিল না। এরূপ অনুমান হয়, যে পিতা মাতা দেখিতেন যে তাঁহাদের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও সন্তান পল্লীর বালকদলে মিশিত, এবং এমন অনেক বিষয় শিক্ষা করিত, যাহা তাহার জানা উচিত নয়। তখন তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্র তখন আলিপুরে কাজ করিতেন ও কালীঘাটের সন্নিহিত চেতলা নামক স্থানে বাসা করিয়া থাকিতেন। পিতা মাতার উদ্বেগ দেখিয়াই কেশবচন্দ্র বাগকে কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ১৮২৬ সালে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে কলিকাতাতে আনিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারম্ভ। কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী কালীঘাটের সন্নিকটস্থ চেতলা নামক স্থানে নিজ জ্যেষ্ঠের বাসাতে আসিলেন। জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র ভ্রাতার শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করেন, এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। তখন চেতলার সন্নিকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না। কেশবচন্দ্র ভ্রাতাকে উত্তমরূপ ইংরাজী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতাতে রাখা চাই, কিন্তু এই সুকুমার বয়সে সহোদরকে কোথায় রাখেন, কে বা তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, কিসেই বা তাহার থাকিবার ও শিক্ষার ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হয়, এই সকল ভাবিয়া দারুণ দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সময়ে তিনি একটী কাজ করিয়াছিলেন, যাহার ইষ্টফল লাহিড়ী মহাশয়ের পরজীবনে দেখা গিয়াছিল। এরূপ অনুমান করা যায় কলিকাতাতে আসিবার পূর্ব্বেই তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে রামতনু কিছুদিন পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং স্বল্পরূপ ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়া আসিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধ্যাতে শিক্ষকের ভার গ্রহণ করিয়া কনিষ্ঠের এই দুই বিষয়ের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজে পারসী ও আরবীতে পারদর্শী ছিলেন; সুতরাং সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ খাতা বাঁধিয়া দিয়া ভ্রাতাকে মনোযোগ সহকারে ইংরাজী লিখাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে কেহ লাহিড়ী মহাশয়ের হাতের ইংরাজী লেখার প্রশংসা করিলে তিনি বলিতেন "দাদা এই লেখার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।"

এইরূপে কেশচন্দ্রের অবিশ্রান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে নবাগত সহোদরের শিক্ষা এক প্রকার চলিল। কিন্তু তাহা কেশবের মনঃপূত হইত না। কারণ দিবসের অধিকাংশ ভাগ তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে থাকিতে হইত, তখন বালক রামতনু বাসায় ভৃত্য বা দাসীর হস্তেই থাকিতেন। চেতলার দাস দাসীগণকে

এখনও যেরূপ বিকৃত দেখা যায়, তখন তাহারা যে কিরূপ ছিল তাহা বলিতে পারি না। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি তীর্থস্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা অতি জঘন্য। বহুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিশীল, নরনারী এই সকল স্থানে সর্ব্বদাই আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া বা পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিবার মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য লোক এই সকল তীর্থস্থানের চারিদিকে বাস করে। দুশ্চরিত্রা নারীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। যাত্রীদিগকে বাসা লইতে হইলে অনেক সময়ে এই সকল নারীদের ভবনেই বাসা লইতে হয়। তাহারা দিনে যাত্রীদিগকে বাসা দিয়া ও রাত্রে বারাঙ্গনাবৃত্তি করিয়া দুই প্রকারে উপার্জ্জন করিতে থাকে। যখন রূপ ও যৌবন গত হয় তখন ইহাদের অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। চেতলা তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও চেতলা বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলণ্ডে যে সকল চাউলের রপ্তানী হইত চেতলা সে সকল চাউলের সর্ব্বপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতী আসিয়া কালীঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী টালির নালা নামক খালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝী প্রভৃতিতে চেতলা পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ প্রবাসবাসী বণিকদলের আবাসস্থানে কিরূপ লোকের সমাগম হয় সকলেই তাহা অবগত আছেন। সকলেই অনুমান করিতে পারেন কিরূপ সামাজিক জলবায়ুর মধ্যে ও কিরূপ সংসর্গে বালক রামতনু চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ স্থলে ও এরূপ সংসর্গে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই।

কেশবচন্দ্র এরূপ স্থানে ও এরূপ সংসর্গে ভ্রাতাকে রাখিয়া সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। কিরূপে তাহাকে সরাইতে পারেন সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেন। অবশেষে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন কালীশঙ্কর মৈত্র নামক নদীয়া জেলা নিবাসী একজন ভদ্রলোক কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামে কালীশঙ্করের একজন আত্মীয় ব্যক্তি মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত কোনও বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিতেন এবং হেয়ারের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনারি কেরী সাহেবের শিক্ষকরূপে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংস্কর্ত্তা ও প্রকাশকরূপে বঙ্গসমাজে পরিচিত হন। পরে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইলে, তাহার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ইঁহারই নিকটে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট পাঠনার রীতির অনেক আখ্যায়িকা সংস্কৃত কালেজে প্রচলিত আছে। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০। ৬৫ বৎসরেরও অধিক হইবে, এবং যখন কালেজে আসা যাওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন বোধ হইত, তখনও কালিদাসের শকুন্তলা বা ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’ পড়াইবার সময়ে তিনি এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে পড়াইতে পড়াইতে ভাবাবেশে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতেন ও বর্ণিত বিষয়ের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অপর শিক্ষকদিগের মধ্যে কেবল D. L. Richardsonএর বিষয়েও এইরূপ শুনিয়াছি, তিনিও সেক্সপীয়র পড়াইবার সময়ে আত্মহারা হইতেন।

যাহা হউক এই সময়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কলিকাতা সহরের একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার হেয়ারের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেশবচন্দ্র, কালীশঙ্কর মৈত্রকে কর্ম্মলাভ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু তাহার প্রতিদান স্বরূপ এই কথা থাকিল, যে কালীশঙ্কর গৌরমোহনকে ধরিয়া রামতনুকে হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। গৌরমোহন এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন কৌলীন্য ও বংশমর্য্যাদার প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন, যে তিনি কুলীনের সন্তান বলিয়া বিদ্যালঙ্কার আনন্দের সহিত তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন।

একদিন গৌরমোহন, বালক রামতনুকে চেতলা হইতে আনাইয়া, সঙ্গে করিয়া গ্রে সাহেবের গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। হেয়ারের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উমেদার ও স্কুলের বালকের অপ্রতুল হইত না। বালকগণ আসিলে হেয়ার তাহাদিগকে শুধু-মুখে যাইতে দিতেন না; পরিতোষপূর্ব্বক মিঠাই খাওয়াইয়া ছাড়িতেন। তাঁহার ভবনের সন্নিকটে এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল; তাহার সহিত

হেয়ারের ঐ প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। বিদ্যালঙ্কার, বালক রামতনুকে সেই মিঠাইওয়ালার দোকানে বসাইয়া রাখিয়া, হেয়ারের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে ভর্ত্তি করিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। হেয়ার এরূপ অনুরোধ উপরোধে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই দলে দলে বালক—"me poor boy, have pity on me, me take in your school" বলিয়া তাঁহার পাল্কীর দুই ধারে ছুটিত। তদ্ভিন্ন পথে ঘাটে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অনুরোধ উপরোধ করিতেন। যে সময়ে বিদ্যালঙ্কার বালক রামতনুকে লইয়া উপস্থিত হন, সে সময়ে হেয়ার ফ্রী বালক লওয়া এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন; যে কয়টী ফ্রী রাখিয়াছিলেন সমুদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিদ্যালঙ্কারের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"খালি নাই, এখন লইতে পারিব না।"

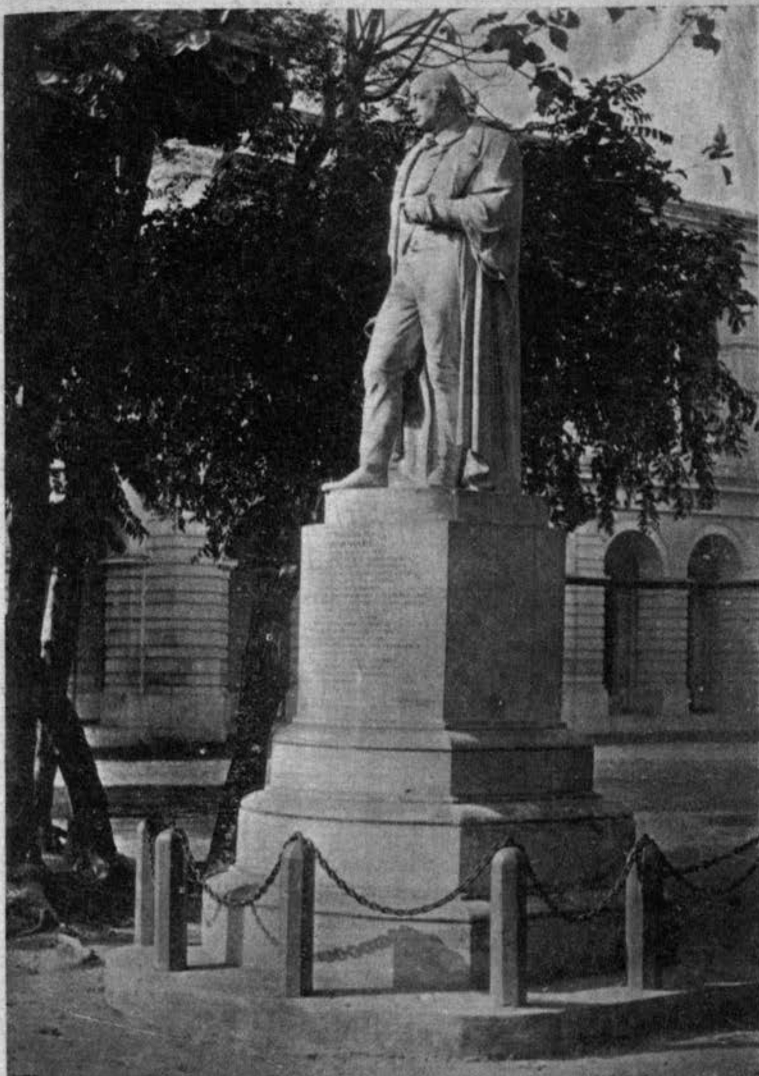
বিদ্যালঙ্কার হেয়ারের নারীসুলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। তিনি নিরাশ না হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়া দিলেন—"হেয়ারের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে।" বালক রামতনু তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি হাতিবাগানে বিদ্যালঙ্কারের বাসা হইতে সকাল সকাল আহার করিয়া, কোনও দিন বা অনাহারে, হেয়ার বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই, গে সাহেবের ভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতেন; এবং তাঁহার পাল্কীর সহিত ছুটিতে আরম্ভ করিতেন। হেয়ারের পাল্কী নানা স্থানে যাইত, এবং এক এক স্থানে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিত। রামতনু সর্ব্বত্রেই যাইতেন ও অপেক্ষা করিতেন। একদিন অপরাহ্নে হেয়ার স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়া পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন বালকটীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। অনুমানে বুঝিলেন সেদিন তাহার আহার হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আহার করিবে?" বালক রামতনু আহারের কথা শুনিয়াই ভয় পাইলেন; বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী লোকের ভবনে আহার করিলে পাছে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—"না, আমার ক্ষুধা পায় নাই।" হেয়ার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমাকে সত্য বল, আমার বাটীতে তোমাকে খাইতে হইবে না, ঐ মিঠাইওয়ালা তোমাকে খাইতে দিবে। সত্য করিয়া বল আজ আহার করেছ কি না?"

বালক রামতনু কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"আজ আমার খাওয়া হয় নাই।" তখন মহামতি হেয়ার তাঁহার মিঠাইওয়ালাকে পেট ভরিয়া মিঠাই খাইতে দিতে বলিলেন। এই প্রকারে দিবাশেষে অনেক দিন হেয়ারের মিঠাইওয়ালার নিকট তাঁহার দিনের আহার মিলিত।

এইরূপে প্রায় দুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষে হেয়ার বুঝিলেন এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহার অতিশয় আগ্রহ। তখন তাঁহাকে ফ্রী বালকদের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই অবস্থার এক নূতন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। স্কুলের বালকদিগের পরিচ্ছন্নতার দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসিত তাহা দেখিয়া তিনি ক্লেশ পাইতেন। কোন কোনও দিন স্কুল বসিবার বা ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি গামছা হস্তে স্কুলের দ্বারে দাঁড়াইতেন এবং প্রবেশ বা নির্গমনের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন বালকদিগকে ধরিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক মায়ের মত উত্তমরূপে গা মুছিয়া দিতেন। বালকদিগকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি ফ্রী বালকদিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করিবার সময় তাহাদের অভিভাবকদিগকে একখানা একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে যে কোন বালক যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসে তাহা হইলে অভিভাবককে জরিমানা দিতে হইবে।

লাহিড়ী মহাশয়কে ভর্ত্তি করিবার সময়ে সেই প্রশ্ন উঠিল। হেয়ার বলিলেন,—তাঁহার জ্যেষ্ঠকে উক্ত প্রকার একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি যখন কলিকাতায় থাকি না, তখন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইতেছে তাহা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে; এরূপ স্থলে আমি কিরূপে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করি। তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে বিদ্যালঙ্কার অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে রাজি করিলেন। রামতনু স্কুল সোসাইটীর স্থাপিত স্কুলে ফ্রীবালকরূপে ভর্ত্তি হইলেন। ঐ স্কুল পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল, ও তৎপরে হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে মহাত্মা হেয়ারের জীবনচরিত কিছু বলা আবশ্যক।

ডেভিড্ হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০০ সালে ঘড়িওয়ালার কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন। এখানে বাসকালে



ডেভিড্ হেয়ার।

(৪৬ পৃষ্ঠা

B. Kar, Bee Press.

কর্ম্মসূত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়। হেয়ার নিজে উচ্চদরের শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে এদেশের লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। তদনুসারে তাঁহার দোকানে কেহ ঘড়ি কিনিতে বা মেরামত করিতে গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। ১৮১৪ সালে রামমোহন রায় যখন কলিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্পকালের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সভা ভঙ্গের পর দুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অবশেষে স্থির হইল যে এদেশীয় বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্কুল স্থাপন করা হইবে। আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট (Sir Hyde East) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে। মহা-বিদ্যালয় বা বর্ত্তমান হিন্দুস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, হেয়ার তাহার কমিটীর একজন সভ্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি ডাক্তার এইচ, এইচ উইলসনের (Dr. H. H. Wilson) পরামর্শের অধীন থাকিয়া অবিশ্রান্ত মনোযোগের সহিত স্কুলটীর উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি দিবসে হিন্দুকলেজ খোলা হয়। সেই বৎসরেই হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে স্কুলবুক সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপিত হইল। ঐ সভার সভ্যগণ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সভার স্থাপন বঙ্গদেশের নবযুগের একটী প্রধান ঘটনা। কারণ এই সভার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এদেশে শিক্ষার এক নূতন দ্বার ও নূতন রীতি উন্মুক্ত করিয়াছিল। রামমোহন রায় তাঁহার বন্ধু হেয়ারের সহায় হইয়া নূতন ধরণের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও জ্যাগ্রাহি নাম দিয়া একখানি ভূগোলবিবরণ লিখিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রণীত ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জ্যাগ্রাহির

উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে এই সভার সাহায্যে নানাপ্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিতে লাগিলেন।

১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটী নামে আর একটী সভা স্থাপিত হইল। হেয়ারও রাধাকান্ত দেব তাহার সম্পাদকের পদগ্রহণ করিলেন। কলিকাতার স্থানে স্থানে নূতন প্রণালীতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য ছিল। হেয়ার ইহার প্রাণ ও প্রধান কার্য্য-নির্ব্বাহক ছিলেন। তিনি ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি সেজন্য তাঁহার ঘড়ির ব্যবসায় রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার বন্ধু গ্রেকে ঘড়ির কারবার বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে সহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় পূর্ব্বক তদুৎপন্ন আয় দ্বারা নিজের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং অনন্য-কর্ম্মা হইয়া এদেশের বালকদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আড়পুলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পাল্কীতে আরোহণ পূর্ব্বক, তিনি স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্ত্তমান হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইতেন। প্রথমে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন; তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, তাহাদের ভবনে গিয়া তাহাদিগের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন; অবশেষে হিন্দুকালেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন; সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে সমস্ত দিন সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; সায়ংকালে বাস ভবনে ফিরিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, অনেক বালকের আত্মীয় স্বজন নিজ নিজ ভবনে হেয়ারের মুখ এতবার দেখিতেন যে অনেকে তাঁহাকে আপনার লোক মনে করিতেন। স্কুলের বালকদিগের প্রতি হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাঁহার এত আনন্দ হইত, যে তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটী হইলে ঐ বল ঊর্দ্ধে ধরিয়া উদ্বাহু হইয়া শিশুদলের মধ্যে দাঁড়াইতেন; তাহারা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত; কেহ কোমর জড়াইত; কেহ গাত্র বহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা

স্কন্ধে ঝুলিত; তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বালকগুলির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রামতনুকে তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন এবং চিরদিন তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতেন।

লাহিড়ী মহাশয় যে দিন হেয়ারের স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেই দিন আর একজন উত্তরকাল-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে একশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি রাজা দিগম্বর মিত্র। তাঁহার তৎকালের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য, ইনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়কে ভর্ত্তি করিবার সময় হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বয়স কত?"

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—"১৩ বৎসর।"

হেয়ার বলিলেন—"না, তোমার বয়স ১২র অধিক নয়।"

লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিলেন—"১৩ বৎসর।"

তথাপি হেয়ার বলিলেন, "না—১২ বৎসর"—এবং তাহাই লিখিয়া লইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। আমাদের বোধ হয় হেয়ার জানিতেন, যে এ দেশের লোকে বালক ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে ১৩ বৎসর বলে, কিন্তু ইংরাজী হিসাবে তাহা ১২ বৎসর, সেই জন্যই এই প্রকার করিয়া থাকিবেন।

সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষকের অল্পতাবশতঃ প্রথম শ্রেণীর বালকগণ অনেক সময়ে নিম্নতন শ্রেণী সকলে মনিটারের কাজ করিত। লাহিড়ী মহাশয় যখন সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রথম শ্রেণীর যাদব ও আদিত্য নামে দুইটী বালক মনিটারের কাজ করিত। এই দুইটী মনিটারের বিষয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শেষে এইমাত্র মনে ছিল যে যাদব বালকদিগকে অতিশয় প্রহার করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের নিকট হইতে মিঠাই খাইবার পয়সা লইত। আদিত্য জাতিতে রজক ছিল। সে নাকি পরে একটা স্কুল করিবার ছল করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৭০০৲ সাত শত টকা ঠকাইয়া লইয়াছিল।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ত এক প্রকার হইল; কিন্তু

কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠ করেন, সেই এক মহাচিন্তা। প্রথমে কেশব চন্দ্রের অনুরোধে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁহাকে আপনার বাসায় রাখিতে সম্মত হইলেন। রামতনু সেখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিলেন। সে কালে কর্ম্মস্থানে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার রীতি ছিল না। কলিকাতাতে যাঁহারা বিষয় কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আত্মীয়ের আশ্রয়ে, না হয় দুই দশজনে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। গ্রামের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপার্জ্জনশীল হইলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে অনেকে একে একে আসিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাতে আশ্রয় লইতেন। কেহ বা কর্ম্মের আশায় নিষ্কর্ম্মা বসিয়া খাইতেন; কেহ বা কর্ম্ম কাজ করিয়া সামান্য উপার্জ্জন করিতেন। এরূপ ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করা ভদ্র-গৃহস্থ মাত্রেরই একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অধিকাংশস্থলেই পাকাদি কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র পাচক রাখা হইত না। এই অন্নাশ্রিত বা নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণই পালা করিয়া রন্ধনাদি করিতেন। তাহা লইয়া সময়ে সময়ে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একজনের কার্য্য অপরে করিতে চাহিত না। আপনাদের মধ্যে কোনও অল্পবয়স্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসার নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও তাড়নাদির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্ত্তী করিয়া তাহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ কাজ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। এই সকল কলিকাতা-প্রবাসী নিষ্কর্ম্মা লোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ হইত তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সে সময়ে উপার্জ্জক কলিকাতা প্রবাসীদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক দেখা যাইত যাঁহারা জীবনে অন্ততঃ একবার চরিত্র-স্খলন জনিত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। তখন সুরাপানটা প্রবল হয় নাই; কিন্তু কলিকাতা প্রবাসীদিগের অনেকে গাঁজা ও চরস প্রভৃতিতে পরিপক্ক হইতেন।

অল্পবয়স্ক বালকগণ স্থানাভাবে এইরূপ বাসাতে এইরূপ সঙ্গে আসিয়াই বাস করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অসঙ্কুচিত আলাপ ও ইয়ারকীর মধ্যে বাস করিয়া তাহারা অকালপক্ক হইয়া উঠিত। তাহাদের বয়সে যাহা জানা উচিত নয়, তাহা জানিত ও তদনুরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাঁতে মিশি লাগাইয়া ও বাঁকা সিঁতে কাটিয়া



রাজা দিগম্বর মিত্র, বাহাদুর সি, এস্, আই।

(৫১ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

সহরের বাবুদের অনুকরণের প্রয়াস পাইত; চরস গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত; এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত।

বালক রামতনু বিদ্যালঙ্কারের হাতিবাগানস্থ বাসাতে এইরূপ সংসর্গে বাস করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি বিদ্যালঙ্কারের নিজের স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না; সুতরাং তাঁহার বাসাটী আরও ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। বাসার লোকে বালক রামতনুকে সর্ব্বদা রাঁধাইত এবং অপরাপর প্রকারে খাটাইত, সেজন্য তাঁহার পাঠেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত।

ক্রমে এই কথা কেশবচন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কনিষ্ঠকে লইয়া শ্যামপুকুর নামক স্থানে স্বীয় পিতার মাতুল-পুত্র রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের ভবনে রাখিয়া দিলেন। খাঁ মহাশয় সে সময়ে নীলের দালালি করিতেন। এখানে আসিয়া রামতনু একটু স্নেহ ও যত্ন পাইতে লাগিলেন। খাঁ মহাশয় সপরিবারে সহরে বাস করিতেন। তাঁহার গৃহিণী বালক রামতনুকে ভালবাসিতেন। কেশবচন্দ্র কনিষ্ঠের দুগ্ধ ও টিফিনের ব্যয় দিতেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত আর সকলই তিনি ঐ গৃহে পাইতেন। কেবল তাহা নহে, শ্যামপুকুরে আসিয়া তাঁহার আর একটা লাভ হইল। তাঁহার সহপাঠী বালক দিগম্বর মিত্র তখন শ্যাম-পুকুরের নিকটস্থ শ্যামবাজারে নিজের মাতুলালয়ে বাস করিতেন। রামতনু দিগম্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার মাতুলালয়ে গেলে দিগম্বরের মাতার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। দিগম্বরের জননী তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন। পিতার গৃহে ভাল দ্রব্য কিছু হইলেই ডাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং সময়ে সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি বিদেশে তাঁহার মাসীর কাজ করিতেন। এই স্নেহ ভালবাসার কথা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে অনেকবার এই স্নেহের বিষয় উল্লেখ করিতেন।

তখন সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে এরূপ প্রণয় সর্ব্বদা জন্মিত। সহরস্থ সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের জননীরা অনেক সময়ে বাস্তবিক মাতৃস্বসার কাজ করিতেন। অনেক সময়ে প্রবাসবাসী বালকগণকে অনেক বিপদ ও প্রলোভন হইতে বাঁচাইতেন। আমাদেরই বালককালে এরূপে কতবার সুরক্ষিত হইয়াছি। অনেক স্থলে প্রবাসবাসী বালকগণ সহাধ্যায়ীদিগের জননীদিগকে মা বা মাসী ও তাঁহাদের ভগিনীদিগকে দিদি বা বোন বলিয়া ডাকিত, এবং যথার্থই সেই প্রকার ব্যবহার পাইত। যাহারা জননী ও ভগিনীগণের স্নেহ ও ভালবাসা

হইতে দূরে আসিয়া পুরুষদলের নীচ আমোদের মধ্যে পড়িয়া থাকিত, তাহাদের পক্ষে এই স্নেহ ও ভালবাসা যে কি মহা ইষ্টসাধন করিত তাহা এখন বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না। উত্তরকালে যাঁহারা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত স্নেহ পাইয়া মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্যবন্ধু গোপালচন্দ্র ঘোষের জননী রাইমণির কথা সকলেই অবগত আছেন। রাইমণি প্রবাস-সমাগত ঈশ্বরচন্দ্রের মাসীর স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ ও যত্নের দ্বারা কিরূপে তাঁহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবনচরিত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াশীল সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

ঠিক কথা! বিদ্যাসাগর যে কলিকাতার ন্যায় প্রলোভনপূর্ণ স্থানে পদার্পণ করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা রাইমণির স্নেহের গুণে। রামতনু বাবুও যে সুকুমার বয়সে, পাপপ্রলোভনের মধ্যে বাঁচিয়াছিলেন, তাহাও যে অনেকটা রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের গৃহিণীর ও দিগম্বর মিত্রের মাতার স্নেহের গুণে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? মাতা ও ভগিনীর স্নেহ ছাড়িয়া যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই স্নেহ এক মহা রক্ষাকবচের ন্যায় হইয়াছিল।

হায়! বর্ত্তমানকালে সহাধ্যায়ীদিগের ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত সে সখ্যভাব আর দেখা যায় না। এক্ষণে এক একটী শ্রেণীতে ৬০।৭০ এরও অধিক বালক বসে, সুতরাং সম্বৎসরের মধ্যে বালকে বালকে আলাপ পরিচয় হওয়া কঠিন, সখ্যস্থাপন ত দূরের কথা। লোকে মনে করিয়া থাকে, লিখিয়া পড়িয়া কৃতী ও কার্য্যক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা, কিন্তু গুরু শিষ্যে ভক্তির সম্বন্ধ, বালকে বালকে সখ্যভাব যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ তাহা অনেকে জানে না, সেই জন্য বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় মানুষ প্রস্তুত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

অতঃপর কলিকাতার তদানীন্তন স্বাস্থ্যের অবস্থার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান গ্যাসালোকে আলোকিত, প্রশস্ত-রাজ-বর্ত্ম-মণ্ডিত, ড্রেণ-সমন্বিত কলিকাতাতে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা সে সময়কার স্কুলের বালক-গণের কঠোর তপস্যার ভাব কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। তখন কলিকাতায় আসিলে অধিকাংশ বালকই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার গুরুতর পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইত। এই পীড়া সচরাচর অজীর্ণতাদোষ রূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিত; পরে জ্বর বিকার দিয়া উপসংহার করিত। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, ইহারই কয়েক বৎসর পরে বিদ্যাশিক্ষার্থ আসিয়া কিছু দিন রামতনু বাবুর বাসাতেছিলেন। তিনি সে সময়কার কলিকাতার অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"তৎকালে মফঃস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে 'লোণা লাগা' কহিত। যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোণা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন, এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত, একারণ আমি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল; এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক্ উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ সেবনে কোনও উপকার না হওয়াতে

নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলোম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল।"

এখন মফস্বল হইতে পীড়িত হইয়া লোকে সুস্থ হইবার জন্য কলিকাতা নগরীতে আগমন করে; তখন কলিকাতাতে দুইমাস থাকিলেই লোকের শরীর ভগ্ন হইত এবং কলিকাতা হইতে বাহির হইলে তৎপর দিনই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইত! সে সময়ে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল তাহাতে এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র ছিল না। তখন জলের কল ছিল না; প্রত্যেক ভবনে এক একটী কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই চারিটী পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি, যখন কলিকাতার পত্তন হয় তখন বর্ত্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। সহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের ক্ষেতে পুষ্করিণী খনন করিয়া করিয়া বাস্তু ভিটা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়াছে। এই অনুমানের আর একটী প্রমাণ এই যে উক্ত পুষ্করিণী সকল সহরের পূর্ব্বাংশেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ সুতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রাম সকল নদী পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল; সেখানে অধিক পুষ্করিণীর প্রয়োজন ছিল না।

এই পুষ্করিণী গুলি জ্বরের উৎস স্বরূপ ছিল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে কয়েকটী দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে দিতেন না; সেইগুলি লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্ব্বপ্রধান ছিল। উড়িয়া ভারিগণ ঐ জল বহন করিয়া গৃহে গৃহে যোগাইত। যখন জলের এই প্রকার দুরবস্থা তখন অপরদিকে সহরের বহিরাকৃতি অতি ভয়ঙ্কর ছিল। এখনকার ফুটপাথের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক একটী সুবিস্তীর্ণ নর্দ্দামা ছিল। কোন কোনও নর্দ্দামার পরিসর আট দশ হাতের অধিক ছিল। ঐ সকল নর্দ্দামা কর্দ্দম ও পঙ্কে এরূপ পূর্ণ থাকিত, যে একবার একটী ক্ষিপ্ত হস্তী ঐরূপ একটী নর্দ্দামাতে পড়িয়া প্রায় অর্দ্ধেক প্রোথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল। এই সকল নর্দ্দামা হইতে যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বর্দ্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক একটী শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ দিন রাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে বস্ত্রদ্বারা আবৃত না করিয়া সেই সকল পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না। মাছি ও মশার উপদ্রবে দিন রাত্রির

মধ্যে কখনই নিরুদ্বেগে বসিয়া কাজ করিতে পারা যাইত না। এই সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কল্‌কেতায় আছি।"

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদ্‌গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে, পূজা পার্ব্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্য-ভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্ত্তকী সহরে আসিত, তাহারা বাইজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাইজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমব্রিকের বনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত

চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা, ও মাহেশের স্নান-যাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।

এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একটা একটা আড্ডা ছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভদ্রগৃহের নিকর্ম্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে এক একজন এক একটী পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঁজাতে উন্নতিলাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত! এবিষয়ে সহরে অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক ভদ্রসন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া কাঠঠোক্‌রার পদ পাইল। কয়েক দিন পরে তাহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অমনি সে "কড়ড়্‌ঠক্‌" করিয়া তাঁহার হস্তে ঠুক্‌রাইয়া দিল!

কবি, পাঁচালী ও বুলবুলীর লড়াইএর একটু বর্ণনা আবশ্যক। কবির গান সচরাচর দুইদলে হইত। কোনও একটা পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দুই দল দুই পক্ষ লইত। মনে করুন একদল হইল যেন কৃষ্ণ-পক্ষ আর এক দল হইল যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সহরে

হরু ঠাকুর ও তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও সহরে অনেক বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিল। ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রুতকবি থাকিত; তাহাদিগকে সরকার বা বাঁধনদার বলিত। বাঁধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি তখনি গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন কোনও কবির দলে বাঁধনদারের কাজ করিয়াছিলেন। দ্রুতকবিত্বের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সে সময়ে আণ্টুনী ফিরিঙ্গী নামে একজন কবিওয়ালা ছিল। আণ্টুনী ফরাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান; বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়ালা হইয়া উঠে। আণ্টুনী নিজে একজন দ্রুতকবি ছিল। আণ্টুনী একবার গান বাঁধিল;

"ও মা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি জেতে আমি ফিরিঙ্গী।"

তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল;—

"যিশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে,
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক তরাতে। ইত্যাদি।

এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সর্ব্বদাই হইত। হাপ আকড়াইগুলি অধিকাংশ স্থলে সখের দল ছিল। তাহাতে ভদ্রপরিবারের যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া নানা বাদ্যযন্ত্রসহ গান করিত।

পাঁচালীর ব্যাপার অন্য প্রকার। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ে তাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল-গায়ক স্বরূপ হইয়া সুর ও তান সহকারে, পদ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণন করিত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবসূচক এক একটী গান করিত। ইহাও লোকে অতিশয় পছন্দ করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন পাঁচালীওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচালী গায়কদিগের মধ্যে দাশরথী রায়ের নামই সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলাস্থ বাদমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথী প্রথমে কোনও কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঁচালী গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পাচালী এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে

দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাকিত যে এখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয় কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। কিন্তু তখন লোকে পাঁচালী গান শুনিবার জন্য পাগল হইত।

বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ী উড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া বহু সংখ্যক বুলবুলী পক্ষী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাঁধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। ঢাউসঘুড়ী, মানুষঘুড়ী, প্রভৃতি ঘুড়ীর প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ীর খেলা দেখিতেন।

সহরের লোকের ধর্ম্মভাবের অবস্থা তখন কি প্রকার ছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে উদ্ধৃত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' উক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ ছিল। লোকে মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্রপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল; ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন



রাজা রামমোহন রায়।

(৫৯ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া, পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া, সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতি দিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ।"

একদিকে যখন সহরের এই প্রকার অবস্থা তখন অপরদিকে ঘোর আন্দোলনে সহর কম্পিত হইতেছিল। সে আন্দোলনের প্রথম কারণ রামমোহন রায়ের উত্থাপিত ধর্ম্মান্দোলন। এই যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জীবনচরিত সকলেরই বিদিত, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি :—

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় শৈশবে তাঁহাকে নিজভবনে সামান্যরূপ শিক্ষা দিয়া ৯।১০ বৎসর বয়সের সময়ে পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনা নগরে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া পারসী ও আরবীতে সুশিক্ষিত হন। এরূপ জনশ্রুতি যে পাটনা বাসকালে কোরাণ পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে

তিনি ঐ পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্ত্তন করিয়া পারসীতে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা লইয়া নাকি তাঁহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে। সেই মনান্তর নিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী ফকীরদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করাতে, তাহারা তাঁহার প্রাণহানি করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া স্বদেশে পলাইয়া আসেন। আসিয়া কাশীধামে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার পুনরায় সম্মিলন হয়। পিতা তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। পিতার আদেশে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী স্বীকার পূর্ব্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়া, অবশেষে রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের শেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮০৩ অব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুরশিদাবাদে গমন করেন; এবং সেখানে "তহতুল মোহদ্দীন" নামক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পরে দশ বৎসর বিষয়কর্ম্ম করিয়া তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে স্থায়ী রূপে আসিয়া বাস করেন।

তিনি কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে রঙ্গপুরে থাকিতেই ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেখানে বিষয়কর্ম্ম করিয়া যে কিছু অবসর পাইতেন, তাহা নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনাতে যাপন করিতেন। সায়ংকালে তাঁহার ভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী, মুসলমান মৌলবী, জৈন মারোয়ারী প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম হইত। রাজা তাঁহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া সকলের বাগ্বিতণ্ডা শুনিতেন এবং যথাসাধ্য মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন। এখানেও তিনি সকল শ্রেণীর নিকটে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেন। এরূপ জনরব যে তিনি রঙ্গপুরে থাকিতে পারস্য ভাষায় একেশ্বর বাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; এবং বেদান্তদর্শন অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলনের ফলস্বরূপ রঙ্গপুরেই তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দী দেখা

দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনিও জজ সাহেবের দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; অনেক লোক ইঁহারও অনুগত ছিল। ইনি রামমোহন রায়ের মত খণ্ডনের উদ্দেশে "জ্ঞানাঞ্জন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থ ১৮৩৮ সালে কলিকাতাতে সংশোধিত আকারে মুদ্রিত হয়।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই সকল আলোচনা ও গ্রন্থ-প্রচার দ্বারা দেশ মধ্যে সর্ব্বত্রই আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার কলিকাতা আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন-তরঙ্গ এখানে পৌছিয়াছিল। তিনি কলিকাতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল, ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি বিষয়ী লোক তাঁহাকে পদস্থ ও ক্ষমতাশালী জানিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার মানসে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ সালে "আত্মীয়-সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। তাহাতে বেদান্তধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত। এই শাস্ত্রীয় বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন।

এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নামক একজন মান্দ্রাজ প্রদেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাতে আগমন করেন, এবং দম্ভ করিয়া বলেন যে বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, এজন্য রামমোহন রায় বেদ বেদান্তের দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা বলিতেছেন; তিনি বেদোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে প্রতিমা-পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। এই সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার করিবার জন্য বিহারীলাল চৌবে নামক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী একজন ব্রাহ্মণের ভবনে এক মহাসভার আয়োজন হয়। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহন রায়ের দলের বিচার হইবে এই বার্ত্তা সহরে প্রচার হইলে, সভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। রামমোহন রায় সদলে, হিন্দুসমাজপতি রাধাকান্ত দেব পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধব সহ, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বৈদিক-শাস্ত্র-জ্ঞানবিহীন দেশীয় ব্রাহ্মণগণ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সমক্ষে হাঁ করিতে পারিলেন না। কেবল রামমোহন রায়ের সহিত সমানে সমানে বাগ্‌যুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী পরাভব স্বীকার করিলেন; নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা

বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 'রামমোহন রায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন,' এই বার্ত্তা যখন তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় সহরে ব্যাপ্ত হইল, তখন তাঁহার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল।

একদিকে যেমন আত্মীয় সভার অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়া গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

আত্মীয় সভা স্থাপন করিয়া রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিলেন। বেদান্তদর্শনের অনুবাদ ১৮১৫; বেদান্তসার, এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, ১৮১৬; কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ, এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে ১৮১৭; সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচারপুস্তক, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা পুস্তক, এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ—১৮১৮; সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ—১৮১৯। এই সকল গ্রন্থের উত্তরে তাঁহার বিরোধিগণ তাঁহার প্রতি অভদ্র কটূক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় অপরাজিতচিত্তে ঐ সমুদয় কটূক্তি সহ্য করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায়ের ধর্ম্মবিচার প্রথমে হিন্দুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তিনি বেদান্তদর্শনাদি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়া স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন, এবং আত্মীয় সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার করিতেছিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, যে ১৮১৭ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকালেজ স্থাপিত হয়, তখন সহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত এক কমিটীতে কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটী হইতে তাড়িত হইয়া নিজে ধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলন ত পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, ইহার উপরে আবার ১৮২০ সালে রামমোহন রায় যীশুর উপদেশাবলী নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া বাপ্তিষ্ট (Bapitst) সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারি মিষ্টার উইলিয়াম আডাম খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ

অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের সহিত রামমোহন রায়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উপর্য্যুপরি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮২৬ সালে রামতনু বাবু যখন বিদ্যারম্ভ করিলেন, তখন রামমোহন রায় হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় দলের অপ্রিয় ও উভয়ের কটূক্তির লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিয়াছিলেন। বাবুদের বৈঠকখানাতে, রাজপথে, লোক সমাগম স্থলে, এমন কি স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা ও বাগ্বিতণ্ডা সর্ব্বদা চলিত।

এতদ্ভিন্ন তখন সহরের লোকের চিত্তকে উত্তেজিত করিবার আর একটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটী অব্ পবলিক ইনষ্ট্রকশন্ নামে একটী কমিটী স্থাপিত হয়। তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। ঐ কমিটী তদানীন্তন প্রাচ্যশিক্ষা-পক্ষপাতীদিগের পরামর্শে কলিকাতাতে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা স্থির করেন। রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সমগ্র কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যয়িত হইতে চলিল। তখন তিনি এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে, ইহাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না। এই বিষয় লইয়া রাজপুরুষদিগের মধ্যে এবং দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে দুইটী দল হইয়া পড়িল। একদল বলিতে লাগিলেন প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে; আর এক দল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যাহা কিছু প্রাচ্য সকলি মন্দ, যাহা কিছু প্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে বঙ্গদেশে প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। যাহা হউক এই ১৮২৬ সালে এই উভয় দলের বিবাদে কলিকাতা সমাজ অতিশয় আন্দোলিত ছিল।

আর এক কারণে তখন সহরের লোকের মন অতিশয় উত্তেজিত ছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিকটেই এক হত্যাকাণ্ড ঘটে, তাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সহমরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়; এবং সহমরণ প্রথা নিবারিত না হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি

নিয়ম স্থাপিত হয়। লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নী একজন মনস্বিনী ও সুলেখিকা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিনের ঘটনাবলীর দৈনিক লিপি লিখিয়া রাখিতেন। তদ্দ্বারা সে সময়কার অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সেই দৈনিক লিপি হইতে উক্ত হত্যাকাণ্ডের নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"A young man having died of cholera his widow resolved to mount the funeral pile. The usual preparations were made, and the licences procured from the magistrate. The fire was lighted by the nearest relations; when the flame reached her, however, she lost courage, and amid a volume of smoke and the deafening screams of the mob, tomtoms, drums &c. she contrived to slip down unperceived, and gained a neighbouring jungle. At first she was not missed; but when the smoke subsided, it was discovered she was not on the pile. The mob became furious and ran into the jungle to look for the unfortunate young creature, dragged her down to the river, put her into a dingy, and shoved off to the middle of the stream, where they forced her violently overboard and she sank to rise no more!"

এই ঘটনাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; এবং রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য আবার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। লর্ড আমহার্ষ্ট ব্রহ্মযুদ্ধে অনেকের, বিশেষতঃ বিলাতের প্রভুদিগের, অপ্রিয় হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি একেবারে এ প্রথা রহিত করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন করিলেন। সেগুলি এই—(১ম) কোনও সহগমনার্থিনী বিধবাকে স্বামীর দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্যরূপে দগ্ধ করা হইবে না, বা অপর কোনও প্রকারে হত্যা করা হইবে না; (২য়) সহগমনার্থিনী বিধবাগণের অপরের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পত্র লইলে চলিবে না, নিজে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় জানাইতে হইবে ও অনুমতি লইতে হইবে, (৩য়) সতীর সহমরণে সহায়তাকারী কোনও ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবে না; (৪র্থ) সহমৃতা বিধবার মৃতপতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত হইবে।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে সহমরণ নিবারণের চেষ্টা এই প্রথম নহে। ইহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে।

এদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাজ রাজপুরুষগণের দৃষ্টি এই নৃশংস প্রথার উপরে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম এদেশের প্রজাগণের মনোরঞ্জন করা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; পাছে এদেশের লোকের ধর্ম্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হয় এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা সংকুচিত থাকিতেন; সুতরাং তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে শত শত বিধবাকে মৃতপতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেন না। এমন কি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের কাশীমবাজারস্থ কুঠির সমক্ষেই রামচাঁদ পণ্ডিত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা পত্নী সহমৃতা হন। তখন সার ফ্রান্সিস রসেল কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি, তাঁহার পত্নী, ও পরবর্ত্তীকাল-প্রসিদ্ধ মিষ্টর হলওয়েল সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। হলওয়েল (Holwell) স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় লেডী রসেল (Lady Russel) নাকি ঐ রমণীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ইংরাজকর্ম্মচারিগণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না।

এই ভাবে বহুদিন গেল। অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি একটু দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্য কিছু করা উচিত বলিয়া তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই গবর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি বিধবাদিগকে যাহাতে বলপূর্ব্বক দাহ করা না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে তৎকালে গবর্ণর জেনেরাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার আইনাদি প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী আইনাদি প্রণয়ন করিতে হইলে তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মতি ও ফৌজদারী কিছু করিতে হইলে নিজামত আদালতের অনুমতি লইতে হইত। কারণ উক্ত উভয় আদালত ইংলণ্ডাধিপতির অধীন ছিল এবং তাঁহাদের অনুমতি ইংলণ্ডাধিপতির অনুমতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তদনুসারে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল ঐ প্রশ্ন নিজামত আদালতের নিকট প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন। নিজামত আদালতে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন কোর্ট-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল। ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পর্য্যন্ত এবিষয়ে আর কিছু করা হইল না।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কয়েকটী সহমরণের কথা নিজামত আদালতের গোচর করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলেন। তদনুসারে ৩রা সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গবর্ণর জেনেরালকে বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রার্থনীয় বলিয়া পত্র লিখিলেন। ইহার পরেও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এই প্রথা বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইলে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল যে সহগমনার্থিনী বিধবাকে অগ্রে জেলার মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোনও রাজকর্ম্মচারীর নিকট অনুমতি পত্র লইতে হইবে। এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহুসহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্ব্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায় এই বিবাদের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রানুসারে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিলেন; এবং পূর্ব্বোক্ত আবেদন পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া এক আবেদন পত্র গবর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহাও প্রাচীন সমাজের লোকের তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবার একটী প্রধান কারণ হইল।

১৮২৫ সালের আন্দোলনে পুরাতন দলাদলিটা আবার পাকিয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল দুই দলে আবার তর্ক বিতর্ক চলিল। রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দ্রিকা" সতীদাহের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে রামমোহন রায়ের নামে গান বাঁধিয়া লোকে পথে পথে গাইত। সেই গীত স্কুলের বালকদিগের মুখে মুখে ঘুরিত। সে সঙ্গীতের কিয়দংশ এই,—



স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর ।

৬৭ পৃষ্ঠা ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা ।